ভগবান তথাগত

ইন্দিরা দেবী

প্রকাশক :
শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত
প্রকাশ উপসমিতি
পশ্চিমবঙ্গ ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব কমিটি
রাজভবন, কলিকাতা-১

০

ছেপেছেন :
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

০

ব্যবস্থাপনা :
অরুণ চক্রবর্তী
অরুণালোক প্রকাশনী
৪০, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১২

০

বাঁধিয়েছেন :
শ্রীনাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৮, পাটোয়ার বাগান লেন
কলিকাতা-৯

০

ছবি ছেপেছেন :
চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লি
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রী
কলিকাতা ৯

০

ছবি এঁকেছেন :
শ্রীআশাবরী দেবী
শ্রীঅতসী বড়ুয়া
নীহার ঘোষ (নন্দন)

'ভগবান তথাগতের' ব্লকটি শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিকের সৌজন্যে

বুদ্ধদেবের নশ্বর দেহত্যাগ যাহাকে বৌদ্ধধর্মে 'মহাপরিনির্বাণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে তা যে ২৫০০ বৎসর পূর্বে ঘটেছিল ঐতিহাসিক তথ্য সে কথা বহন করে এনেছে। ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ মানব যাঁহাকে অনেক মনীষী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব বলেছেন তাঁহার এই মহাপরিনির্বাণ উৎসব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সব দেশ উৎসাহের সঙ্গে পালন করছে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী না হলেও বুদ্ধের বাণী ও জীবন ভারতে এই সুদীর্ঘকাল ধরে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে এসেছে। বুদ্ধকে দশাবতারের এক অবতার বলে স্বীকার করে শতশতাব্দী ধরে ভারতবাসী বুদ্ধের পূজা করে এসেছে। ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি ভারতের গৃহে গৃহে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত মর্যাদা লাভ করে এসেছে। বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীতে ভারতের বহু মনীষী গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। তথাপি বিংশ শতাব্দী জগতের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর কথা বুদ্ধজীবনীর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ভূয়সী আলোচনার প্রয়োজন। তাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান — ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্বৎসরব্যাপী ২৫০০তম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ জয়ন্তী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ জয়ন্তী কমিটি সেই উৎসবের প্রাদেশিক অঙ্গস্বরূপ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেই কর্মসূচীর মধ্যে বুদ্ধ বাণী সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশ একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিতা। পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধ জয়ন্তী কমিটির অনুরোধে ইনি বহু যত্নে ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত বুদ্ধের এই জীবন কাহিনী সকলের সহজবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। আমার বিশ্বাস তাঁর রচিত 'ভগবান তথাগত' পুস্তকখানি পাঠক সাধারণের সমাদর লাভ করবে এবং ২৫০০ বৎসর পরেও আমাদের দেশে বুদ্ধের বাণীর প্রচার ও আলোচনা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

রাজভবন
১লা নভেম্বর, ১৯৫৬

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব কমিটি

"যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজারূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হ'ত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে—কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানব কর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীতকালের মহৎ প্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে: বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।"

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিধান চন্দ্র রায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

কোলকাতা

১৯৫৬
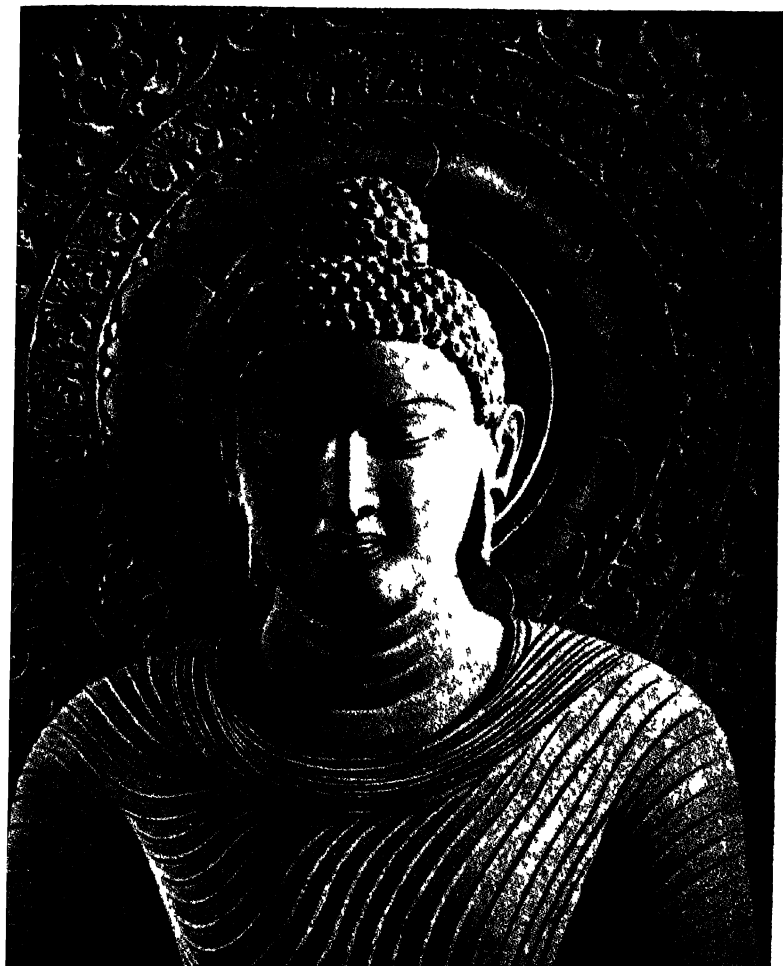
"বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো ।
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো ।
বন্দামি বুদ্ধম্‌ অহমাদবেণ তম্‌ ॥"

ভগবান তথাগত

বুদ্ধ ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর মত মহান্ ধর্ম-প্রবর্তক, সমাজ সংস্কারক, লোকশিক্ষক পৃথিবীর ইতিহাসে অল্পই আবির্ভূত হয়েছেন। এই মহামানব ভারতের মাটিতে জন্মেছিলেন এটা ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবনী, চিন্তাধারা ও ধর্মমতের প্রভাব আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ যে স্থানটী অধিকার করে আছেন সেটী একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন একটি দ্বিতীয় চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে না যিনি ঐ স্থানটীর কাছাকাছি পৌছতে পেরেছেন। ভারতের মাটীতে ধর্ম ও দর্শন যেমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর আর কোনো দেশে তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই বিভিন্ন যুগে ভারতে বহু ধর্ম-প্রবর্তক আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও ভারতের ইতিহাসে বহু সাধক ও মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। দার্শনিক চিন্তা-ধারার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও বহু প্রতিভাশালী পুরুষের অবদান রয়েছে। এঁরা সকলেই কৃতী পুরুষ এবং এঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবই একমাত্র ধর্মগুরু ও দার্শনিক—যাঁর চিন্তাধারা ও ধর্মমতের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে তৎকালীন পশ্চিম এশিয়া, উত্তর পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইয়োরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ কোনদিন রাজ্য-জয়ের কল্পনা নিয়ে অকারণ শক্তিক্ষয়ের সর্বনাশী নেশায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ওঠে নি। ভারতবর্ষ চিরকালই অধ্যাত্ম সাধনার প্রাধান্য মেনে এসেছে। কিন্তু ভার-তের এই বিশিষ্ট সাধনার ধারা বহুকাল ধরে ভারতবর্ষের মাটীতে সীমাবদ্ধ ছিল। বুদ্ধদেবই সর্বপ্রথম ভারতীয় সাধনার এই দৃষ্টিভঙ্গীটিকে সার্বজনীন করে

তুলেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ভারতবর্ষকে পৃথিবীর দেশ দেশান্তরের সঙ্গে একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। এইখানেই বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠত্ব আর এই কারণেই বুদ্ধ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে থাকলেও তাঁর জীবন আলেখ্য আমাদের চোখে সবটুকু ধরা পড়েনি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বুদ্ধের ধর্মমত ও দার্শনিক চিন্তাধারাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী আর সেটাই হয়তো স্বাভাবিক; কিন্তু সাধারণ মানুষ তাতে পরিতৃপ্ত হতে পারে না, তারা জানতে চায় সেই রক্তমাংসে গড়া মানুষটীকে যিনি পৃথিবীর মানুষকে শুনিয়েছিলেন শান্তি ও অহিংসার বাণী। কিন্তু সাধারণ মানুষের সে ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির সুযোগ পায় না। বুদ্ধদেবের জীবনীর পরিচয় সমসাময়িক সাহিত্যে তেমন পাওয়া যায় না। দুটি একটি সুত্তে এবং সুত্তনিপাত গ্রন্থে তাঁর জীবনীর কিছুটা উল্লেখ আছে। তাঁর জীবনের যে-সব কাহিনীর সঙ্গে আমরা পরিচিত তার অধিকাংশই পরবর্তীকালে রচিত সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমসাময়িক যুগের সাহিত্যের মত পরবর্তী যুগে রচিত সাহিত্য নির্ভরযোগ্য নয়—এই ধরনের সাহিত্য থেকে বুদ্ধের জীবনের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য কাহিনী সংগ্রহ করা কঠিন। সুতরাং সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের সাহিত্য থেকে অলৌকিক কাহিনীগুলো বর্জন করলে বুদ্ধের জীবনের যে ইতিহাস পাওয়া যাবে সেটী অকিঞ্চিৎকর।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার—বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে আমরা দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত উদাসীন ছিলাম। বুদ্ধদেবকে আমরা যতটা ভক্তি করেছি তাঁর চিন্তাধারা ও মতবাদকে ততটা স্বীকার করিনি। এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে পাশ্চাত্য মনীষীরা যদি কঠোর পরিশ্রম ক'রে—বৌদ্ধসুত্ত, পিটক ও অন্যান্য সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা না করতেন তাহ'লে আমরা বৌদ্ধধর্ম ও মতবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারতাম না। এই কারণে পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। এই প্রসঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগে 'ধম্মপদের' বাংলা অনুবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত ভালোবাসাই কেবল গভর্ণমেণ্ট এর দ্বারে ভিক্ষা কার্য্যের মধ্যেই আবদ্ধ—আর কোনোদিকেই তাহার কোনও গতি নাই। সমস্ত দেশে পাঁচজন লোক কি বৌদ্ধ শাস্ত্র উদ্ধার করাকে চির জীবনের ব্রত স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এইপথে ধাবিত হইবে না?"

পঞ্চাশ বছর আগে এই কথাগুলো লেখা হয়েছিল। তারপর প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং অনেক নতুন তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় মনীষীদের কাছে আমাদের ঋণ অস্বীকার করা যায় না।

দুই

বুদ্ধের জন্ম কাহিনী সম্পর্কে, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৬৩ অব্দে লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমায় এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বুদ্ধের পূর্ব্ব নাম ছিল গৌতম বা শাক্যসিংহ। শাক্য নামক ক্ষত্রিয় বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল তাই তাঁর নাম শাক্যসিংহ। আর গোতম গোত্রে জন্মেছিলেন বলে তাঁকে গৌতম বলা হতো। তাঁর জন্ম হলে পিতা শুদ্ধোদনের পুত্রলাভ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছিল তাই তাঁর আর একটি নাম সর্বার্থ-সিদ্ধি বা সিদ্ধার্থ।

প্রাচীন পালি সাহিত্য থেকে জানা যায় যে শাক্যরা ক্ষত্রিয় বংশ বলে পরিচিত ছিল। সুত্তনিপাতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে বুদ্ধ নিজেকে শাক্যবংশ উদ্ভূত বলে পরিচয় দিচ্ছেন—আর শাক্যদের তিনি আদিত্য বা সূর্যবংশীয় বলে বর্ণনা করেছেন। মঝ্‌ঝিমনিকায় নামক গ্রন্থেও শাক্যগণকে ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে এবং এই গ্রন্থ অনুসারে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং বুদ্ধ উভয়েই ক্ষত্রিয় রূপে বর্ণিত হয়েছেন। *

এই শাক্য বংশ ক্ষত্রিয় হলেও অনেককাল ধরে কোশল বা মহাকোশল রাজ্যের অধীন ছিল। সুত্তনিপাতে বুদ্ধ কোশল এবং শাক্য রাজ্যের ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেছেন। ভদ্দসালজাতকেও শাক্যদের কোশলরাজ্যের

---

* পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ইক্ষ্বাকু বংশীয় একব্যক্তি শাক নামক বৃক্ষকে আশ্রয় করে বসবাস করেছিলেন বলে তাঁর বংশ শাক্য বংশ নামে পরিচিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আচার্য্য ভরত বলেছেন, "শাক্য বংশত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ। তথাহি শাকো নাম বৃক্ষ বিশেষঃ তত্র ভবো বিদ্যমানঃ শাক্য শাকঃ। পিশ্চঃ শাপেণ কশ্চিদিক্ষ্বাকুবংশীয়ো গোতম বংশজ কপিলে মুনেরাশ্রমে শাক বৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্যঃ উচ্যতে। তদুক্তম্—শাকবৃক্ষে প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাং প্রচক্রিরে তাস্মাদিক্ষাকু বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।

প্রজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মঝ্ঝিমনিকায়ে বুদ্ধ এবং তাঁর বংশোদ্ভূত সবাইকে কোশলের অধিবাসী বলে উল্লেখ আছে। এই সব প্রাচীন গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে শাক্যরা কোশল রাজ্যের অধীন ছিল এবং দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত এদের কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে শাক্যরা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের প্রথম ভাগ থেকে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে আরম্ভ করে। যে সময়ে মগধাধিপ বিম্বিসার রাজগৃহে, অঙ্গাধিপতি ব্রহ্ম-দত্ত চম্পানগরে, লিচ্ছবীগণ বৈশালীতে এবং কোশলপতি প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী নগর থেকে রাজ্যশাসন করেছিলেন সেই সময় কোশল রাজ্যের পূর্বভাগে রোহিণী নদীর তীরে শাক্য ও কোলিয় নামে দু'টি ক্ষত্রিয় শাখা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল। এই সময়ে আর্যাবর্তের প্রাধান্য নিয়ে মগধ নরপতি ও কোশলরাজ পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলে শাক্যরা সুযোগ বুঝে কোশলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। রোহিণী নদীর এক তীরে শাক্য রাজ্য আর এক তীরে কোলিয় রাষ্ট্র।

উত্তরে হিমালয়, পূর্বে রোহিণী, পশ্চিমে আর দক্ষিণে রাপ্তী নদী এই নিয়ে হলো শাক্য রাজ্যের সীমানা। রাজ্যের রাজধানী হলো কপিলাবস্তু। বৌদ্ধ সাহিত্যে কপিলাবস্তুকে বিশাল রাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। আয়তন অথবা মর্য্যাদা কোনো দিক থেকেই শাক্যরাজ্য অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে না। বুদ্ধের জন্মকালে তাঁর পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন এ রাজ্যের রাজা। কিন্তু প্রাচীন পালি-সাহিত্যে শুদ্ধোদনকে কোথাও রাজা বলা হয় নি; তাঁকে শুধু শাক্য শুদ্ধোদন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই থেকে অনুমান হয় যে শুদ্ধোদন প্রথম জীবনে কোশল রাজ্যের অধীন সামন্তমাত্র ছিলেন কিন্তু পরবর্তী যুগের পুঁথিপত্রে শুদ্ধোদনকে রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রাজা হলেও শুদ্ধোদন বা তাঁর বংশধরেরা উত্তরাধিকারের দাবীতে রাজ্যশাসন করতেন না। শুদ্ধোদন ছিলেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে শাক্য রাজ্যের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত সব কাজ নির্বাহ করা হতো একটি গণপরিষদের সাহায্যে। এই পরিষদের অধিবেশন হতো 'সন্থাগার' নামে পরিষদ গৃহে। শাক্যদের কাছে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ একবার

মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব করে পাঠান। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল সন্থাগারে। পরবর্তী কালে আরো বহু গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে এই সন্থাগারেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা সন্থাগারের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন কিন্তু প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এই সব থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শাক্য রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে শাসিত হতো। প্রাচীন সাহিত্যেও শাক্য রাষ্ট্রকে গণরাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো গ্রন্থে শুদ্ধোদনকে মহাপরাক্রমশালী নরপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যতদূর জানা যায় শুদ্ধোদন যে অঞ্চলে রাজত্ব করতেন আয়তনের দিক থেকে তাকে খুব একটা বৃহৎ অঞ্চল বলে মনে করা যায় না। কিন্তু অঞ্চলটি বৃহৎ না হলেও ধনধান্যে সমৃদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই ছিল কৃষিজীবী। তাদের সংখ্যা কত জানা যায় না। তবে বুদ্ধঘোষ একটি প্রাচীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে বলেছেন যে শুদ্ধোদনের আত্মীয়দের সংখ্যা আশী হাজারের কম ছিল না। কোলিয়দের সংখ্যাও প্রায় সমান ছিল। সমস্ত রাজ্য জুড়ে ছিল অসংখ্য পল্লী। সকল পল্লীর বাসভূমির সংলগ্ন ছিল বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। এই রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন ছিল পল্লী-নির্ভর। ধান থেকে এদের প্রধান আয় হতো। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শুদ্ধোদনই ছিলেন ধান্য সম্পদে সমৃদ্ধতম। আর এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁর নাম হয়েছিল শুদ্ধোদন (ওদন = ধান্য)। কাশী কোশল-অঙ্গ-মগধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্য করে আর্যাবর্তে যে জটিল রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল কপিলাবস্তুর শান্ত পল্লী-নির্ভর জীবনে তার প্রভাব বহুকাল অনুভূত হয় নি।

প্রাচীন ঋষিরা আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত এই স্বপ্ন সার্থক হয় নি। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যা জানা যায় তাতে আর্যাবর্তে অন্ততঃ চারিটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। তাছাড়া খণ্ড বিচ্ছিন্ন বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কতকগুলো রাষ্ট্র গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী শাসিত

হতো। কিন্তু এদের কোনও একটারও তেমন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। আর্যাবর্তের রাজ্যচতুষ্টয় সার্বভৌম প্রাধান্য লাভের জন্য যখন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত তখন কপিলাবস্তু রাজ্যের অধিবাসীদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। দেশের রাষ্ট্রশক্তি যাদের হাতে ন্যস্ত ছিল কোশল-মগধ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তারা কপিলাবস্তুর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু রাজ্যের জনসাধারণ এই রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

শাক্য আর কোলিয় এই দুটী ক্ষত্রিয় বংশ পাশাপাশি থাকতো। সম্ভবতঃ একই সঙ্গে এরা কোশলরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে স্বাধীন হয়েছিল। এই দুই বংশের মধ্যে কখনও সম্প্রীতির অভাব হয় নি। এই দুই রাজ্যের রাজবংশের মধ্যে বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় শাক্যরাজ শুদ্ধোদন আর কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধ পরম মিত্র ছিলেন এবং এই মিত্রতা বন্ধন দৃঢ়তর করবার জন্য শুদ্ধোদন কোলিয় রাজকুমারী মায়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। মায়াদেবীর আর একটি ভগ্নী ছিলেন; তাঁর নাম মহাপ্রজাবতী। শুদ্ধোদন সুপ্রবুদ্ধের অনুরোধে এঁকে তাঁর দ্বিতীয় মহিষীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের পর প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত শুদ্ধোদন অপুত্রক ছিলেন। এই জন্য রাজপরিবারে কারো মনে শান্তি ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল যে মায়াদেবীর সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। বৌদ্ধ লেখকদের মতে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একটি শ্বেত হস্তী তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে গর্ভে প্রবেশ করছে। এই স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুদ্ধোদন জানতে পেরে রাজ্যের জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠালেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বল্লেন যে মায়াদেবীর গর্ভে সর্বসুলক্ষণযুক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। এর কিছুদিন পর প্রাচীন প্রথা অনুসারে মায়াদেবী সূতিকাগারে আবদ্ধ হবার জন্য পিত্রালয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই পথে লুম্বিনী উদ্যানে তার একটি পুত্র জাত হলো। নবজাত কুমার ও প্রসূতিকে তখনই কপিলাবস্তুতে ফিরিয়ে আনা হলো। পরবর্তী কালের বৌদ্ধ লেখকরা ভগবান বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তাঁর জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের দেবতারা নবজাতককে মহামূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে মাতৃগর্ভ থেকে

গ্রহণ করলেন। এই সময় মর্ত্যে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সবই অবশ্য কল্পনাপ্রসূত বর্ণনা। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মহাপুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অলৌকিক কাহিনীর প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি বুদ্ধের আবির্ভাব কাল।

সিদ্ধার্থেব জন্ম সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র রাজ্যের সর্বত্র আনন্দের স্রোত বয়ে চললো। রাজা জ্যোতিষীদের আবার ডেকে পাঠালেন। তাঁরা নবজাতককে দেখে তাঁদের পূর্বের ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতিধ্বনি করে বল্লেন: এই শিশু কালক্রমে মহাপুরুষ বলে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করবেন। কিন্তু রাজ-প্রাসাদে আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। শিশুর জন্মের সাতদিন পর মায়া দেবী পরলোক গমন করলেন। মাতৃহীন শিশুর লালন পালনের ভার পড়লো বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর উপর।

পরবর্তী যুগে জনশ্রুতি অবলম্বন করে সিদ্ধার্থের বাল্য জীবন সম্পর্কে যে সব কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল তাদের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে বুদ্ধের জন্মের কিছু পরেই প্রচলিত প্রথা অনুসারে নবজাতককে শাক্যবর্দ্ধন যক্ষের মূর্তির সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শাক্যদের মধ্যে এই নিয়ম বহুকাল থেকে প্রচলিত ছিল যে যখনই তাদের গৃহে কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, তখনই তাকে এই যক্ষ মূর্তির কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। এই মূর্তিটিকে শাক্যদের অধিষ্ঠাতৃ দেব বলে মনে করা হতো। নবজাত শিশুকে এই মূর্তির সামনে নিয়ে প্রণাম করান হতো। শুদ্ধোদনও পিতৃ-পুরুষের নিয়ম মেনে সিদ্ধার্থকে নিয়ে সেই মূর্তিটির কাছে গেলেন, সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। শিশুটীকে যখন যক্ষ মূর্তির সামনে স্থাপন করা হলো তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন সে পাথরের তৈরী সে মূর্তির মাথা প্রণামের ভঙ্গীতে শিশুটীর পায়ের কাছে নেমে এলো। এরপর জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণীর সাফল্য সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকলো না। সেদিন যক্ষমন্দিরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা শিশুর নামকরণ করলেন 'দেবাতিদেব'।

সিদ্ধার্থের বাল্যকাল সম্পর্কে এমনি বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে। কোন কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে সিদ্ধার্থের বয়স

যখন কয়েকমাস মাত্র তখন তার ধাত্রী একদিন একটা স্বর্ণের বাটীতে করে তাকে দুধ খাওয়াতে যাবেন কিন্তু বাটীটা যে স্থানে ছিল সে স্থান থেকে তিনি কিছুতেই তুলতে পারছিলেন না। এ রকম খবর পেয়ে সকলেই সেখানে উপস্থিত হলেন এমন কি শুদ্ধোদন পর্যন্ত এলেন কিন্তু একে একে সকলেই চেষ্টা করে সেই স্বর্ণের বাটিটী তুলতে পারলেন না। তারপর শুদ্ধোদনের আদেশে পাঁচশো হাতী নিয়ে আসা হলো কিন্তু হাতীরাও অসমর্থ হলো। এমনি সময়ে শিশু সিদ্ধার্থ এক আঙ্গুল দিয়ে বাটীটা টেনে তুলে নিলেন।
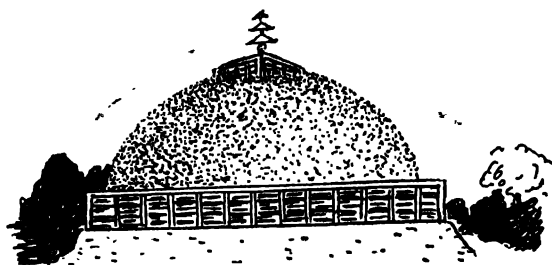
তিন

এখন সিদ্ধার্থ অনেক বড় হয়েছেন। হাঁটতে চলতে পারেন। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা করেন। জ্যোতিষীরা সিদ্ধার্থের সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন যে কালক্রমে তিনি একজন মহাপুরুষ হবেন—সে খবর শুধু কপিলাবস্তুর শাক্যরাই জানতো তা নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বৈশালীর লিচ্ছবীরাও এ সংবাদ জেনেছিল। এই কারণে লিচ্ছবীরা সুসজ্জিত ও অলঙ্কারে ভূষিত একটি হাতী সিদ্ধার্থকে উপহার পাঠিয়েছিল। সিদ্ধার্থকে সকলেই খুব প্রীতির চক্ষে দেখতেন—কিন্তু একমাত্র তাঁর আত্মীয় দেবদত্ত তাঁকে ঈর্ষা করতেন। লিচ্ছবীদের কাছে থেকে যেদিন হাতীটি কপিলাবস্তুতে আসছিল সে খবর দেবদত্ত পূর্বে জানতে পেরে নগরের উপকণ্ঠে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর হাতীটা নগরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি তীর ছুঁড়লেন আর সঙ্গে সঙ্গে হাতীটি মারা গেল। এই ঘটনার পরেই সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে হাতীটাকে দেখে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধার্থ সেখানে উপস্থিত হলেন—তিনি হাতীটাকে দেখে তার লেজ ধরে দু'চার পাক ঘুরিয়ে তুলে নিয়ে এত জোরে ছুঁড়ে ফেললেন যে অতবড় প্রাণীটা অনেকখানি দূরে যেখানে ছিটকে পড়লো সেখানে একটা গর্ত হয়ে গেল। পরবর্তীকালে এই স্থানটী হস্তীগর্ত নামে পরিচিত হয়েছিল। আর এখানে বুদ্ধদেবের শিষ্যরা একটি স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

আর একদিনের ঘটনা। রাজপরিবারের বালকদের মধ্যে শর নিক্ষেপের পরীক্ষা হচ্ছিল। সকলেই নিজ নিজ শক্তির পরীক্ষা দিল—তারপর এল সিদ্ধার্থের পালা। সিদ্ধার্থ সব ক'টি লক্ষ্যই ভেদ করলেন এবং সবচেয়ে দূরে যে লক্ষ্যটি অবস্থিত ছিল—তাতে গিয়ে তাঁর তীর এত জোরে আঘাত করলো যে তার ফলে মাটী থেকে বেরিয়ে এলো জলের

উৎস। এই স্থানটিও পরবর্তীকালে বুদ্ধভক্তরা স্তূপ নির্মাণ করে চিহ্নিত করে রেখেছিল। বুদ্ধদেবের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এ রকম বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব বহুপ্রচলিত কাহিনীর জালাবরণ ভেদ করলে তাঁর বাল্য এবং কৈশোরের যে বাস্তব নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যাবে সেটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। যতটুকু জানা যায় সিদ্ধার্থ অল্প বয়সে শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা দুইই আয়ত্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুলভ এবং সহদেব নামে দু'জন শিক্ষকের কাছে তিনি অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেছিলেন আর কুল-পুরোহিতের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। অল্পকাল মধ্যে সিদ্ধার্থ সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কিছুকাল প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। অধ্যয়ন সমাপন করে তিনি নিজগৃহে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বয়সের অনুপাতে তাঁর মন পরিণতির দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল।

সিদ্ধার্থ নিজগৃহে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে অসিত নামে এক মহর্ষি কপিলাবস্তু নগরে এসেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে অসিত হিমালয়ের নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে তপশ্চরণ করেছিলেন। পাণ্ডিত্য এবং ধর্মপ্রবণতার জন্য এঁর খুব খ্যাতি ছিল। কপিলাবস্তুতে আসবার পর শুদ্ধোদন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের পূর্বে এবং পরে জ্যোতিষীরা তাঁর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন—সেইসব কথা মনে করে শুদ্ধোদন মনে মনে বড় অস্বস্তি অনুভব করতেন। তাই অসিতের মত বহুদর্শী জ্ঞানী তপস্বী বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি বলেন সেটা জানবার আগ্রহ হলো। অসিত সিদ্ধার্থের দেহে দ্বাদশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ আর অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন দেখে শুদ্ধোদনকে জানালেন যে "যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে তাহলে রাজচক্রবর্তী হবে আর যদি গৃহ ত্যাগ করে তাহলে সম্যক সম্বোধি লাভ করবে।" অসিত এই ভবিষ্যৎ বাণী করে চলে গেলেন। শুদ্ধোদনের মনে যে দুর্ভাবনা ছিল তা আর দূর হলো না।

কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লেখা আছে যে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করবেন জ্যোতিষীরা শুধু এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তা নয়, কোন্ অবস্থায় এবং কোন দৃশ্য দেখে তার মনে সংসার বৈরাগ্য আসবে সে কথাও তাঁরা বলে-

ছিলেন। জাতক এবং বুদ্ধচরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে সে জরা, রোগ, মৃত্যু, সন্ন্যাস এই চারিটি দৃশ্য সিদ্ধার্থের মনে সংসার বৈরাগ্য এনে দেবে। তাই শুদ্ধোদন সর্ব্বপ্রযত্নে সিদ্ধার্থকে বাইরের জগত থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কোন কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে সিদ্ধার্থের জন্য বিভিন্ন ঋতুতে বাসোপযোগী তিনটী স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রাসাদে সযত্নে বিলাসের সর্ববিধ উপকরণ রক্ষিত হয়েছিল। অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সিদ্ধার্থের বাল্যজীবনের যেটুকু কাহিনী জানা যায় তাতে সিদ্ধার্থ বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়ে থাকতেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, খেলা-ধূলা করতেন, শিকারে বার হতেন—এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে একথা সত্য যে তাঁর প্রকৃতি অন্যান্য বালকের তুলনায় স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন-ধর্মী ছিল। বালকসুলভ বৃত্তির বশে সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধূলা অবাধে করতেন কিন্তু কখনও কখনও দেখা যেতো সঙ্গীদের ছেড়ে খেলাধূলা পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেছেন। অনেক সময় নির্জনে বসে অনন্যমনা হয়ে তিনি কি যেন ভাবতেন। একবার সিদ্ধার্থ সঙ্গীদের সঙ্গে নগরের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঙ্গীরা খেলাধূলায় মত্ত হলো কিন্তু সিদ্ধার্থ কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেলেন। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সিদ্ধার্থকে নির্জন বনের একধারে একটি গাছের নীচে গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেল। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলেছিলেন যে একবার তিনি পিতা শুদ্ধোদনের সঙ্গে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করতে গিয়েছিলেন। শুদ্ধোদন যখন গভীর মনোযোগ নিয়ে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করছিলেন তখন পিতার সঙ্গ ত্যাগ করে বালক সিদ্ধার্থ নির্জনে একটি জাম গাছের নীচে বসে ভাবতে ভাবতে প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে আরো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সিদ্ধার্থ যখন গুরুগৃহে শিক্ষা-লাভ করতে গিয়েছিলেন তখন বর্ণমালা শিক্ষা প্রসঙ্গে 'অ' কার উচ্চারিত হওয়ামাত্র "অনিত্যঃ সর্বসংসারঃ" —এই বাক্য তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হয়েছিল। এই সব কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে অল্প বয়স

থেকে সিদ্ধার্থের চরিত্রে গভীর মননশীলতা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

যে সব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বাল্যজীবনে সিদ্ধার্থকে বাইরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করে নির্দিষ্ট প্রাসাদে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল শুদ্ধোদন সেই সব প্রাসাদে যত রকম বিলাসের সামগ্রী সম্ভব সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। নৃত্য গীত ইত্যাদি সুকুমার বিদ্যায় পারদর্শী নরনারী শুদ্ধোদনের অনুগ্রহে প্রাসাদে স্থানলাভ করেছিলেন। এই ব্যবস্থা সিদ্ধার্থের যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইন্দ্রিয় ভোগের যত রকম উপকরণ তা জড় করে সিদ্ধার্থকে পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দেখিয়ে শুদ্ধোদন চেয়েছিলেন জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ করতে। সিদ্ধার্থকে তিনি যে সুখ ঐশ্বর্য্যে লালন পালন করেছিলেন তাই নয়, ক্ষত্রিয় রাজকুমারের উপযোগী শিক্ষার সর্ববিধ ব্যবস্থাই তিনি পুত্রের জন্য করে দিয়েছিলেন। পালি সাহিত্য থেকে সিদ্ধার্থের বাল্য এবং কৈশোর সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান হয় যে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় যুবকের উপযোগী শিক্ষাই পেয়েছিলেন। এক-দিকে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, অপরদিকে অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি আদর্শ ক্ষত্রিয়ের উপযোগী শিক্ষালাভ করেছিলেন।

চার

শুদ্ধোদনের ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র রাজচক্রবর্তী রূপে অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করবে সুতরাং তিনি অল্প বয়স থেকে তাঁকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করবার সর্ববিধ চেষ্টা করেছিলেন। বুদ্ধচরিত গ্রন্থকারের মতে শুদ্ধোদন আশা করেছিলেন যে ভবিষ্যতে সিদ্ধার্থ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন।

শাক্য নায়কের পক্ষে শাক্যবংশধর সসাগরা পৃথিবীতে না হোক, অন্ততঃ আর্যাবর্তে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করবেন এই কামনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পুত্র যাতে পিতার এই স্বপ্ন সার্থক করতে পারে তার জন্য পিতা পুত্রের যথোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এটাও স্বাভাবিক।

সিদ্ধার্থের বাল্যজীবন সম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে যেমন নির্ভরযোগ্য প্রায় কোন পরিচয়ই নেই, তাঁর কৈশোর এবং যৌবন কাহিনীও তেমনি উপেক্ষিত হয়েছে—কিন্তু বহু শতাব্দী পরে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাতে সিদ্ধার্থের কিশোর এবং যুবা বয়সের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। তিব্বতী গ্রন্থে তাঁর কিশোর জীবনের একটি ঘটনা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থ যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই সময় রোহিণী নদীর তীরে সুলক্ষণযুক্ত একটি মহীরুহ জন্মালো। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে এই গাছটীর নাম করণ করা হয়েছে 'কল্যাণগর্ভ' নামে। একদিন এক প্রবল ঝড়ে এই গাছটী নদীর উপর পড়লো এবং তাতে নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। নদীর পরপারে ছিল কোলিয় রাজ্য—জল অভাবে সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত রইল না। তখন কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধ শাক্য নেতা শুদ্ধোদনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। শুদ্ধোদনের লোক-জনেরা অনেক চেষ্টা করেও সে গাছটীকে স্থানচ্যুত করতে পারলো না। সুপ্রবুদ্ধ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থের অলৌকিক শক্তির কাহিনী শুনতে পেয়ে-

ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের উপরই এই দুরূহ কাজের ভার দেবেন। কিন্তু শুদ্ধোদন তাঁর পুত্রকে এ ব্যাপার সম্পর্কে কোনো কথাই জানালেন না। ক্রমে কোলিয়রাজ্যের অধিবাসীদের দুর্দশা যখন চরম আকার ধারণ করলো তখন সিদ্ধার্থের বিশ্বস্ত অনুচর ও সারথি ছন্দক তাঁকে নিয়ে রোহিণী নদীর তীরে গেল। নদীর ধারে ধারে ছিল নানা ফল ফুলের মনোরম বাগান। সিদ্ধার্থ সেই বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমনি সময় আকস্মিক ভাবে শরাহত হয়ে একটি বিহঙ্গ তাঁর পদমূলে পতিত হলো। তিনি পাখীটাকে অতি যত্নে পরিচর্যা করছিলেন—এমনি সময় তাঁর আত্মীয় দেবদত্ত এসে বিহঙ্গমটীকে দাবী করলেন কেননা তিনিই তাকে তীরবিদ্ধ করেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করে বললেন বিহঙ্গটীব প্রাণনাশ করতে যিনি উদ্যত হয়েছিলেন—সেটী তাঁর প্রাপ্য নয়। যিনি বহুকষ্টে এর প্রাণদান করেছেন পাখীটি তাঁরই প্রাপ্য। দেবদত্ত বিফল হয়ে চলে গেলেন কিন্তু সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে রইল। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধার্থ অদূরে বহুলোকের কোলাহল শুনতে পেলেন। তিনি সেই কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে ছন্দককে সঙ্গে করে নদীর তীরে গিয়ে দেখলেন যে নদীর ওপর থেকে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে সরাবার জন্য বহুলোক মিলিতভাবে চেষ্টা করছে—কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও তারা গাছটীকে কিছুতেই স্থানচ্যুত করতে পারলো না—তখন সিদ্ধার্থ অগ্রসর হয়ে এক হাতে অবলীলাক্রমে সে গাছটীকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন—আর গাছটী দু' টুকরো হয়ে গিয়ে নদীর দু'ধারে ছিটকে পড়লো। অবরুদ্ধ জলস্রোত আবার স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হতে লাগলো এবং কোলিয় রাজ্যের জলাভাব দূর হলো।

সিদ্ধার্থের বাল্য এবং কিশোর জীবন সম্পর্কে এমনি বহু ঘটনা পরবর্তী যুগে রচিত সিংহলী, তিব্বতী ও পালি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঁচ

সিদ্ধার্থের জীবনে এর পরবর্তী ঘটনা তাঁর বিবাহ। তাঁর মনে সংসার বৈরাগ্যের কোনো লক্ষণ তখনও দেখা যায় নি; তবু শুদ্ধোদন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বরাবরই শঙ্কা বোধ করতেন। রাজকুমারসুলভ শিক্ষা এবং চারিত্রিক মর্যাদা সিদ্ধার্থের মধ্যে পুরোমাত্রায় থাকলেও অনেক সময় তিনি নির্জনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চাইতেন। অনেক সময় সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলো ছেড়ে তাঁকে নির্জনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখা যেতো, তাই শুদ্ধোদনের মনে সর্বদা ভয় কি জানি জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়। সিদ্ধার্থের বয়স যখন আঠারো তখন শুদ্ধোদনের আত্মীয় বান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন যুবরাজের উপযুক্ত বয়স হয়েছে এইবার তার বিবাহের আয়োজন করা সঙ্গত। শুদ্ধোদন তাদের পরামর্শ মেনে নিলেন। সিদ্ধার্থের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কি ভাবে পাওয়া যাবে তাই নিয়ে রাজসভায় আলোচনা চললো। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হলো যে রাজধানীতে একটি আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হবে—তাতে শাক্য রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্য থেকে কিশোরী ও যুবতীদের আমন্ত্রণ করা হবে—তারা নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন—অনুষ্ঠানের শেষে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের পুরস্কৃত করার ভার দেওয়া হবে রাজকুমার সিদ্ধার্থের উপর। সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। সকলের আশা হলো এই অনুষ্ঠানে যে সব কিশোরী যোগদান করবেন তাদের একজনকেই হয়ত সিদ্ধার্থ তাঁর ভাবী পত্নী বলে গ্রহণ করতে সম্মত হবেন। মহাসমারোহে উৎসবের আয়োজন চললো। শাক্যরাজ্যের কোন কিশোরীই এই অনুষ্ঠানে যোগদান না করার কথা ভাবতে পারেন নি। কোলিয় রাজ্য থেকেও বহু তরুণী এই উৎসব-প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এসেছিলেন। বিচিত্র বেশে সজ্জিতা কিশোরী আর তরুণীরা উৎসবে অংশ গ্রহণ করলেন।

সিদ্ধার্থের জন্ম

শুদ্ধোদন নিজে এবং রাজধানীর গণ্যমান্য বহু নাগরিক দর্শকরূপে এই অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে উৎসব শেষ হলো। যারা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তারা একে একে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সুসজ্জিত মঞ্চের মধ্যভাগে ছিল যুবরাজ সিদ্ধার্থের আসন। তিনিই আজ পুরস্কার বিতরণ করবেন। শাক্য তরুণীরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। সিদ্ধার্থ যার যা প্রাপ্য তাকে সেই মত পুরস্কার দিলেন। উৎসবমুখর জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো বিজয়িনীদের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি। প্রতিদ্বন্দ্বিনীরা প্রায় সকলেই পুরস্কার লাভ করে ফিরে গেছেন—উৎসব স্থল প্রায় জনশূন্য হতে চলেছে এমন সময় একটি তরুণী সভামঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন। সিদ্ধার্থ তখনও মঞ্চত্যাগ করেন নি। তরুণী কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে সোজা অগ্রসর হয়ে সিদ্ধার্থের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তারপর সিদ্ধার্থ কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি আয়ত দুটি চক্ষু নির্ভয়ে যুবরাজের মুখের দিকে তুলে প্রশ্ন করলেন "যুবরাজ, আমায় কোন উপহার দেবেন আপনি?" যুবরাজ তরুণীর দিকে মুখ তুলে চাইলেন। অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, দীর্ঘায়ত ঘনপল্লববিশিষ্ট চক্ষু, তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণের আভা, লীলায়িত দেহভঙ্গী—তরুণীর দিকে দৃষ্টিপাত করার পর যুবরাজ সহজে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। তরুণী আবারও প্রশ্ন করলেন—"যুবরাজ! আমায় উপহার দিন।" মুহূর্তে যুবরাজ প্রকৃতিস্থ হলেন। তারপর তার সামনে মঞ্চের যে অংশে উপহার দ্রব্য স্তূপীকৃত ছিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে যুবরাজ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। উপহার সামগ্রীর আর একটিও অবশিষ্ট নেই। মুহূর্তের জন্য যুবরাজের চোখে মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠলো—কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র। পর মুহূর্তে যুবরাজ তার কণ্ঠ থেকে একটি বহুমূল্য হার খুলে নিয়ে তরুণীর হাতে দিয়ে বল্লেন, 'তুমি এইটি গ্রহণ কর, এ ছাড়া তোমায় দিতে পারি এমন যোগ্য পুরস্কার আমার কাছে আর কিছু নেই।' দু'হাত প্রসারিত করে তরুণী সে দান গ্রহণ করলেন। তারপর অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে উৎসব প্রাঙ্গন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। যতক্ষণ তরুণীটিকে দেখা গেল সিদ্ধার্থ অপলক দৃষ্টিতে তার যাত্রা পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শুদ্ধোদন যথাসময়ে সংবাদ পেলেন যে সেদিনকার ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে

যে প্রতিযোগিনীটি সেদিন বিশেষ ভাবে যুবরাজের দৃটি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর নাম গোপা—বন্ধুবর সুপ্রবুদ্ধের কন্যা। শুদ্ধোদন সুপ্রবুদ্ধের কাছে ছেলের জন্য তার কন্যাটিকে প্রার্থনা করলেন। সুপ্রবুদ্ধ এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। সিদ্ধার্থের মত উপযুক্ত পাত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু শাক্য ক্ষত্রিয় সমাজে বহুকাল থেকে একটি রীতি প্রচলিত হয়ে আসছিল —বিবাহেচ্ছু যুবককে মনোনীত পাত্রী নির্বাচনের পূর্বে দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হতো—দৈহিক শক্তি পরীক্ষায় যদি তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতেন তা হলেই তিনি পাত্রীলাভের যোগ্যতা অর্জন করতেন। সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। সুপ্রবুদ্ধের উদ্যোগে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এক বিরাট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। শাক্য ক্ষত্রিয় কুমাররা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করলেন। সিদ্ধার্থ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাজিত করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর সম্মান লাভ করলেন—আব লাভ করলেন তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সুপ্রবুদ্ধ-দুহিতা গোপাকে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে সিদ্ধার্থ-পত্নীকে গোপা ছাড়া আরো কয়েকটি নামে অভিহিত করা হয়েছে যেমন যশোধরা, ভদ্রা, উৎপলবর্ণা, মৃগজা এবং বিম্বা। অনেক গ্রন্থে সিদ্ধার্থ-পত্নীর ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ না করে তাঁকে শুধু 'রাহুলমাতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাহুলমাতাকে কোনো গ্রন্থে সিদ্ধার্থের পিতৃব্য-কন্যা, কোনো গ্রন্থে মাতুল-কন্যা বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

বিবাহের পর কয়েক বছর পর্যন্ত সিদ্ধার্থের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই অতিক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু রাজপ্রাসাদে থেকেও সিদ্ধার্থ সংসার জীবনের প্রতি সহজাত অনাসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। যে পরিবেশে তাঁর শৈশব থেকে যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছিল—সেই পরিবেশ তাঁর মনে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হয়েও সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি তিনি উদাসীন থাকেন নি। কি করে মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট দূর করা যেতে পারে, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ কি ভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারে তাই তিনি গভীর ভাবে অনুধ্যান করতেন। পিতা শুদ্ধোদন এবং অভিভাবকস্থানীয়েরা আশা করেছিলেন যে

বিবাহের পর সংসার জীবনের প্রতি সিদ্ধার্থের আসক্তি বাড়বে, কিন্তু তাঁদের এই আশা পূর্ণ হলো না। গার্হস্থ্য জীবনের রীতি নীতি সিদ্ধার্থ পালন করতে লাগলেন বটে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি যে বিরাট শূন্যতা বোধ করছিলেন তা অপূর্ণই থেকে গেল। যে বিরাট জিজ্ঞাসা তাঁর মনে অনেককাল থেকে দেখা দিয়েছিল সে জিজ্ঞাসার তিনি কোনো সদুত্তর পেলেন না। যথা-কালে সিদ্ধার্থের পুত্রলাভ হলো, সমস্ত রাজ্যে আনন্দ স্রোত বইতে লাগলো। শুদ্ধোদন, মাতা প্রজাবতী, গোপা সকলেই অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ এই আনন্দে পূর্ণমাত্রায় যোগ দিতে পারলেন না। কিছুদিন পূর্ব থেকে তাঁর মনে সংসার ত্যাগের ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। রাহুল ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর এই আকাঙ্খা দুর্নিবার হয়ে উঠলো।

ছয়

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ললিত-বিস্তরে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তার সারমর্ম এই—একদিন সিদ্ধার্থ তাঁর সারথিকে ডেকে বল্লেন: "সারথে, রথ যোজনা কর, আমি উদ্যান ভূমি দর্শন করবো।" সারথি রথ যোজনা করলেন—সেখানে একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোক দেখে সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই লোকটি দণ্ড ধারণপূর্বক অতিকষ্টে স্খলিত গতিতে গমন করিতেছে কেন? ইহার শরীর দুর্বল ও স্থৈর্য্যবিহীন এবং মাংস রুধির ত্বক শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের স্নায়ু সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্তবিরল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি?"

সারথি উত্তর দিল, "দেব, এই ব্যক্তি জরা দ্বারা অভিভূত, দুঃখিত ও বল বীর্যহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই ব্যক্তি এখন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বন মধ্যে জীর্ণ কাষ্ঠ যেমন পড়িয়া থাকে এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্মণ্য হইয়া কালযাপন করিতেছে।"

সিদ্ধার্থ সারথিকে আরো জিজ্ঞাসা করলেন, "এরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি এই লোকটির কুলধর্ম অথবা সংসারের সকলেরই অবস্থা এই রকম হইয়া থাকে? তুমি শীঘ্র ইহার উত্তর প্রদান কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত কারণ চিন্তা করিব।"

তখন সারথি বল্লে "হে দেব, ইহা এই ব্যক্তির কুলধর্ম অথবা রাষ্ট্রধর্ম নহে। সংসারের সকল লোকেই যৌবন ও জরা কর্তৃক অভিভূত হয়। আপনি, আপনার পিতামাতা, বান্ধব জ্ঞাতি কেহই জরার প্রকোপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।"

সারথির উত্তর শুনে সিদ্ধার্থ বললেন, "লোকেরা নির্বোধ। তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক্, যেহেতু তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিতে পান না।

তুমি রথ প্রত্যাবর্তন কর, আমি এই জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে আক্রমণ করিবে অতএব আমার ক্রীড়াসুখে প্রয়োজন কি ?"

এরপর আর একদিন সিদ্ধার্থ যখন নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করতে উদ্যত তখন একটি ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখতে পেয়ে সারথিকে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে সারথে, এই লোকটি নিজ কুৎসিত মূত্র ও পুরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে কেন ? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও সর্বাঙ্গ শুষ্ক। এই ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে ইহার কাবণ কি ?"

সারথি তাঁর কথার উত্তরে জানালে: "হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এই কারণে এই ব্যক্তি অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।"

তখন সিদ্ধার্থ বল্লেন, "আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক, ব্যাধি সমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন না অথবা জগতে সুখ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন না।"

ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থের আরো একটি অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। একদিন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিমদ্বার দিয়ে ভ্রমণ করবার সময় একটি মৃত ব্যক্তিকে দেখে সারথি ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সারথে, এই লোকটি মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন ? ইহার চতুর্দিকে লোকসকল মস্তকে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে। ঐ সকল লোক উহাকে বেষ্টিত করিয়া বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কারণ কি ?"

সিদ্ধার্থের কথা শুনে সারথি বল্লে, "হে দেব, জম্বুদ্বীপে এই লোকটির মৃত্যু হইয়াছে, এই ব্যক্তি পুনরায় পিতামাতা পুত্র পত্নী প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে না; গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে, জ্ঞাতি প্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।"

তখন সিদ্ধার্থ বল্লেন "যৌবনকে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান।

আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী, জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যেহেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত। যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে লোককে পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে হইত না। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি, অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিব।"

ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থের আরো একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত রয়েছে। একদিন তিনি নগরের উত্তর দ্বার দিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করছিলেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন চীরবস্ত্র পরিহিত এক সৌম্যদর্শন সাধু পুরুষ। তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র, গায়ে স্বল্প পরিচ্ছদ, হাতে দণ্ড কিন্তু তাঁর মুখে প্রশান্ত হাস্য রেখা এবং সমস্ত দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অপরূপ জ্যোতি। তাঁর আকৃতি দেখে সিদ্ধার্থ তাঁর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলেন। ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই সৌম্যদর্শন দিব্যকান্তি পুরুষটীর কাছে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে তিনি সংসারের সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন—তিনি মায়া বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে শাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে মোক্ষলাভের সন্ধানে বহির্গত হয়েছেন। সন্ন্যাসীর আকৃতি দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধার্থ পরম প্রীতিলাভ করলেন এবং তার মনে হলো যে সন্ন্যাসী অবলম্বিত নীতি, কার্য্যক্রম ও পন্থা অনুসরণ করলেই মানুষ সংসার জীবনের দুঃখকষ্ট জরামৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিছুকাল থেকে মানুষের জীবনের দুঃখকষ্ট ও অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলে আজ সিদ্ধার্থের মনে হলো সেই সব প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছেন।

ললিতবিস্তরে বর্ণিত এই চারিটি দৃশ্যের কাহিনী পালি, তিব্বতী ও সিংহলী গ্রন্থেও সমর্থিত হয়েছে। শুদ্ধোদনকে ইতিপূর্বেই জ্যোতিষীরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সিদ্ধার্থ যদি জরা, রোগ, মৃত্যু ও সন্ন্যাস এই চারিটি দৃশ্য দেখতে পান তাহলে তাঁকে আর কোন অবস্থায় সংসারে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না। অথচ শুদ্ধোদনের পক্ষ থেকে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও

রাজপথে সিদ্ধার্থের চোখে সেই অনভিপ্রেত চারিটি দৃশ্যই একটি একটি করে উদ্ঘাটিত হলো।

গুরুগৃহে শিক্ষালাভের সময় সিদ্ধার্থের মনে অনিত্য সংসার এই অনুভূতি জেগেছিল তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতি তাঁর মনে তীব্রতর হয়ে দেখা দিয়েছিল। পিতা এবং গুরুজনের ইচ্ছায় তিনি সংসার ধর্ম পালনের চেষ্টা করেছিলেন, রাজকুমারোচিত শিক্ষা গ্রহণ করতে আপত্তি করেন নি, এমন কি বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে অস্বীকৃত হন নি। তবু অন্তরে সংসার সম্বন্ধে তাঁর সহজাত বৈরাগ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় নি, বরং বৃদ্ধিই পেয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল উনত্রিশ বছর বয়সে সেই প্রশ্নের সমাধান লাভের আকাঙ্খাই তাঁকে পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। মানুষ দুঃখ কষ্টের হাত থেকে কি করে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে জরা মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ কি করে অব্যাহতি পেতে পারে—এই চিন্তাই তাঁর অন্তরের অন্য সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যিনি মানুষের দুঃখ দূর করার মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন —সংসারের বন্ধন অথবা রাজৈশ্বর্য্য ভোগের আকাঙ্খা তাঁকে কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করবে এ কথা তাঁর সম্পর্কে ভাবতে পারা যায় না।

সাত

সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণের মুহূর্তটির মত শুভ ও কল্যাণপ্রদ মুহূর্ত মানুষের ইতিহাসে বিরল। বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে তিনি একদিন গভীর নিশীথে তাঁর আত্মীয় পরিজন, পিতা, পত্নী নবজাত পুত্র সকলকে ছেড়ে সংসারের সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে পরহিতার্থে সত্য পথের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাজপ্রাসাদ গভীর সুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন, আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রালোক, রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান সেই চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। রাজপুরীর একটি উন্মুক্ত গবাক্ষ থেকে ক্ষীণ আলোকের মৃদু সঙ্কেত। চতুর্দিকে নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতা; একটু পরেই রাজ অন্তঃপুরের একটি কক্ষের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত হলো আর তার পরেই দ্বার অতিক্রম করে স্বল্পালোকিত অলিন্দ পথে বেরিয়ে এলেন অনিন্দ্যকান্তি সৌম্যদর্শন শাক্য রাজকুমার। অলিন্দ অতিক্রম করে তিনি সোপান বেয়ে ধীর পদ সঞ্চারে অন্তঃপুরের একটি কক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখে মুখে নেমে এলো ক্ষণিকের সঙ্কোচ। পরমুহূর্তে সঙ্কোচ পরিহার করে তিনি দ্বার মুক্ত করে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেই কক্ষে দীপাধারের ক্ষীণ জ্যোতিতে দেখতে পেলেন শ্বেতশুভ্র পালঙ্ক শয্যায় প্রসারিত ঘুমন্ত পত্নী গোপার কুসুমপেলব দেহ। মুহূর্তের জন্য রাজ-কুমারের দৃষ্টি সেই মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হলো—যার সান্নিধ্যে তাঁর জীবনের কয়েকটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল। একটি মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই রাজকুমার দৃষ্টি সংযত করে ফিরিয়ে আনলেন। এবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো দেবকান্তি নবজাত রাহুলের নিদ্রাচ্ছন্ন দেহ। মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজকুমার—তারপর ঘুমন্ত নারী ও শিশুর প্রতি শেষ দৃষ্টির স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে ধীরে ধীরে সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। যুবরাজ স্বল্পালোকিত অলিন্দ পথে অগ্রসর হয়ে আরো কয়েকটি সোপান অতিক্রম

করে অন্য একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হলেন। এটি রাজা শুদ্ধোদনের শয়ন গৃহ। কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল। যুবরাজ তার অর্গল মুক্ত করার কোনো চেষ্টা করলেন না। দ্বার প্রান্তে নত হয়ে ভক্তিভরে একটি প্রণাম রেখে তিনি ধীরে ধীরে সোপান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অলিন্দ পথের দুইধারে সারিবদ্ধ কক্ষ। যুবরাজ নীরবে একটি পর একটি কক্ষ পার হয়ে প্রধান সোপান পথে এসে দাঁড়ালেন। সোপান অতিক্রম করে স্তিমিত আলোকে পথ দেখে তিনি উপস্থিত হলেন প্রাসাদ প্রাঙ্গনে। প্রতিদিন সেখানে সতর্ক প্রহরী থাকে, আজো প্রহরীর অভাব নেই কিন্তু তারা গভীর নিদ্রায় অচেতন। যুবরাজের গতিবিধি কারো লক্ষীভূত হলো না। প্রশস্ত প্রাঙ্গন পার হয়ে যুবরাজ প্রধান তোরণে উপস্থিত হলেন। সুরক্ষিত তোরণ, প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই তোরণ অতিক্রম করা কারো সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে মুহূর্তে যুবরাজ তোরণের সামনে উপস্থিত হলেন সেই মুহূর্তে তোরণটী অর্গলমুক্ত হয়ে যুবরাজের গতিপথের শেষ বাধা অপসারিত করে দিল। তোরণ পার হয়ে যুবরাজ এসে দাঁড়ালেন মুক্ত আকাশের নীচে। সেদিনকার এই মহাভিনিষ্ক্রমণের মুহূর্তটী চিরন্তন হয়ে রইল মানুষের ইতিহাসে।

তোরণের অদূরে রাজকুমারের আদেশে অপেক্ষা করছিল তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর ছন্দক। প্রভুর আদেশমত সে একটি তেজস্বী অশ্ব নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল। সিদ্ধার্থ অশ্বে আরোহণ করলেন। ছন্দক তাঁর অনুসরণ করলো। কিন্তু সেই অশ্বের পদধ্বনি রাজপথে প্রতিধ্বনিত হলো না। অশ্বের কণ্ঠ থেকেও কোন হ্রেষাধ্বনি উচ্চারিত হয়ে নৈশ নীরবতাকে ভঙ্গ করলো না। স্বর্গের দেবতারা অশ্বের কণ্ঠে তার হ্রেষাধ্বনি নিরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন আর অশ্বের পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় নি এই জন্য যে দেবতারা দৈববলে সেই অশ্বকে শূন্য পথে ধাবিত হতে সাহায্য করেছিলেন তাই সেই নিস্তব্ধ রাত্রির দ্বিতীয় যামে যখন অশ্বপৃষ্ঠে ঘুমন্ত রাজপুরীকে পিছনে রেখে যোজনের পর যোজন অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তাঁর অন্তর্দ্ধানের তথ্য সকলের কাছে অনাবিষ্কৃত হয়ে রইল।

সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে এবং পরে জ্যোতিষীরা তাঁর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন সেই বাণী সফল হতে চললো। শুদ্ধোদন পুত্রের ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে যে কল্পনাকে নিজের মনে দীর্ঘদিন থেকে বহু যত্নে পোষণ করে আসছিলেন আজ পরিণত বয়সে পুত্র সেই কল্পনার স্বর্গকে ধূলিসাৎ করে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল করতে উদ্যত হলেন। পালি, তিব্বতী ও সিংহলীগ্রন্থে সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগ প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তাতে এ সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে সে শুদ্ধোদনের সকল প্রচেষ্টা ও সাবধানতা ব্যর্থ করে সিদ্ধার্থ সংসার বৈরাগ্যের পথে পথিক হয়েছিলেন। কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে নিদ্রিত নর্তকীদের অবিন্যস্ত বেশভূষা দেখে সিদ্ধার্থের মনে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, সন্ন্যাস এই চারিটি দৃশ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলে সিদ্ধার্থের মনে সংসার ত্যাগের বাসনা অদম্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রাচীনতম বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা অথবা ঘটনা সিদ্ধার্থকে সংসার ত্যাগে প্রবৃত্ত করেছিল এ মতবাদ সমর্থিত হয় না। এ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ! জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া যখন আমি দেখিলাম যে আমিও জরা মৃত্যুর অধীন, তখন আমার মনে হইল যে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দর্শনে আমার উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর কথা এবং আমাকেও এগুলি ভোগ করিতে হইবে এই কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার যৌবনের মত সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল।"

কোনো একটি বিশিষ্ট ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতা সিদ্ধার্থকে মহাভিনিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত করেছিল এ কথা নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যিনি সংসারের দুঃখ-তাপিত নরনারীর কষ্টে অন্তরে বেদনা বোধ করেছিলেন, 'সংসার অনিত্য' এই জ্ঞান যিনি অল্প বয়সে লাভ করেছিলেন, তিনি গৃহের, পরিবারের গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবেন এটা স্বাভাবিক নয়। মানুষের কল্যাণ সাধনের দুর্নিবার আকাঙ্খা তাঁর মনে দুর্জয় প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তাই সংসার তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি। সন্ন্যাস গ্রহণের আকাঙ্খা তাঁর মনে সহসা দেখা দেয় নি। দীর্ঘকাল ধরে তিনি যে ধ্যান ধারণা পোষণ করে এসেছেন তারই ক্রমিক এবং স্বাভাবিক পরিণতি মহাভিনিষ্ক্রমণ।

সিদ্ধার্থ তাঁর প্রিয় অশ্ব কণ্টকে চড়ে যোজনের পর যোজন অতিক্রম করে চলেছেন—তাঁর একমাত্র সঙ্গী সারথি ছন্দক। কণ্টকের সঙ্গে সিদ্ধার্থের বহুকালের পরিচয়—কত দুর্গম পথে কণ্টক কতবার তার সঙ্গী হয়েছে, আজ সিদ্ধার্থ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছেন—তাকে সার্থক করে তুলতে তিনি চাইলেন কণ্টকের সহযোগিতা। কণ্টকের কণ্ঠলগ্ন হয়ে তিনি বল্লেন—"কণ্টক, আজ তোমাকে সারা রাত ধরে অন্ধকার পথে চলতে হবে, বিশ্রাম করার কোনো অবকাশ আজ তুমি পাবে না। সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার চলার পথে বিরাম আসবে না। তোমার কষ্ট হবে তবুও আমি জানি আমার জন্য সানন্দে তুমি এ কষ্ট বরণ করে নেবে।" মনে হলো কণ্টক তার প্রভুর কথা বুঝতে পারলো। রাত্রির দ্বিতীয় যামে কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ থেকে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল সমস্ত রাত ধরে ঘুমন্ত জনপদকে সচকিত করে চললো সেই যাত্রা। পিছনে পড়ে রইল রাজধানী, শাক্য, কোল্য, মল্ল, মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার কেটে যেতে লাগলো—দূরে, জনপদ গাছপালা দৃষ্টিগোচর হলো। সিদ্ধার্থ ছন্দকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে তাঁরা কপিলাবস্তু রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে এসেছেন। সিদ্ধার্থ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। তারপর ক্ষণকাল বিশ্রাম করে ব্রাহ্মমুহূর্তে নদীতে স্নান সেরে তাঁর শরীরে যে সব বহুমূল্য আভরণ ছিল সে সব একে একে ত্যাগ করলেন। তারপর তিনি ছন্দককে রাজধানীতে ফিরে যেতে বল্লেন। ছন্দক নানা ভাবে এবং নানা কথায় তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন। শুদ্ধোদন এই গৃহত্যাগে কত মর্মান্তিক আঘাত পাবেন, কপিলাবস্তু রাজ্যের প্রজারা তাদের প্রিয় যুবরাজের অদর্শনে কত বেদনা বোধ করবে সে সব বোঝাতে চাইলেন—কিন্তু সিদ্ধার্থ বহুপূর্বেই তাঁর মনস্থির করেছেন। সাংসারিক জীবনের কোনো প্রলোভন, নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রার প্রতিশ্রুতি, ঐশ্বর্য্য বিলাসের প্রাচুর্য্য কোনো কিছুই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারলো না। ছন্দক রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু তাকে একাই ফিরে আসতে হ'লো, কণ্টকও এবার তার সঙ্গী নয়। নিদান কথা নামে পালিগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সিদ্ধার্থ যখন ছন্দককে কণ্টক সহ রাজধানীতে ফিরে যেতে আদেশ করেছিলেন তখন ছন্দক অন্তরে গভীর দুঃখ নিয়ে সে

আদেশ পালন করতে উদ্যত হলেন কিন্তু কণ্টক সে বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারলো না। সেইখানেই নদীর তীরে বহুবৎসরের পরিচিত বিশ্বস্ত কণ্টক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। আভরণের ভারবাহী নিঃসঙ্গ ছন্দক ফিরে এলো রাজধানীতে।

ছন্দকের কাছে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়ে রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানী গভীর শোকে মগ্ন হলো। শুদ্ধোদন আশা করেছিলেন তাঁর পুত্র দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। কিন্তু তাঁর এই আশা ধূলিসাৎ করে পুত্র সংসারের সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলো—এই সংবাদ শুদ্ধোদন এবং শাক্যনায়কদের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। শাক্য রাজ-অন্তঃপুরেও গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এলো। রাজ-বধূ গোপা ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। মহাপ্রজাবতী গৌতমী শোকে দুঃখে অধীর হয়ে পড়লেন। ছন্দকের কাছে সিদ্ধার্থ যে সব অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করেছিলেন সেই সব অলঙ্কার মহাপ্রজাবতীকে দেওয়া মাত্র তিনি একটি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করলেন। রাজধানীর অন্যান্য অধিবাসীরাও এই সংবাদ পেয়ে দুঃখে শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন।

ছন্দককে বিদায় দিয়ে সিদ্ধার্থ নির্জন পথে অগ্রসর হয়ে চল্লেন। এ পথের সঙ্গে তাঁর পূর্বে কোনো পরিচয় ছিল না তবু তিনি সোজা দক্ষিণপূর্ব দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চল্লেন। যে পরিচ্ছদে তিনি পূর্বরাত্রে রাজ-অন্তঃপুর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন এবার তিনি সেই পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। যে পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেটী জনবিরল। কাছাকাছি কোথাও জনপদ অথবা লোকবসতির চিহ্নমাত্র ছিল না। সুতরাং পরিচ্ছদ পরিবর্তন কি করে সম্ভব হতে পারে তাই ভাবতে ভাবতে সিদ্ধার্থ এগিয়ে চলেছেন এমনি সময় অরণ্য পথে এক ব্যাধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। সেই অরণ্য পথে ব্যাধের আবির্ভাব অস্বাভাবিক অথবা আকস্মিক নয়; কিন্তু তিব্বতী গ্রন্থকারদের মতে এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নয়, দেবতা শতকেতু ব্যাধের ছদ্মবেশে ধারণ করে দেখা দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিব্বতী গ্রন্থে যে কাহিনীর উল্লেখ আছে সেটী সংক্ষেপে এই—

অনেক বছর আগে অনুপম নগরে এক ধনী শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। তিনি

মৃত্যুকালে একটি সুতোর তৈরী জামা গ্রামের এক বৃদ্ধাকে দিয়ে যান এবং বলে যান—'রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ যখন এই গ্রামে আসবেন তখন যেন এই জামাটী তাঁকে দেওয়া হয়। বৃদ্ধা বহুদিন অপেক্ষা করে থাকলেন কিন্তু শুদ্ধোদন-পুত্রের সাক্ষাৎ পেলেন না। মৃত্যুকালে সেই জামাটী তাঁর মেয়ের কাছে রেখে গেলেন। মেয়েও সিদ্ধার্থের আগমনের প্রতীক্ষায় রইলেন কিন্তু তিনিও তাঁর দর্শন পেলেন না। মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে এই নিঃসন্তান মহিলাটি জামাটীকে একটি বৃক্ষের শাখায় ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। বৃক্ষ-দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন শুদ্ধোদন-পুত্র যখন আসবেন তখন যেন জামাটী তাঁকে দেওয়া হয়। দেবতা শতকেতু প্রার্থনা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধার্থকে আসতে দেখে ব্যাধের ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। সিদ্ধার্থ যুবরাজোচিত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করার সুযোগ খুঁজছিলেন—তাঁর অনুরোধে ব্যাধ যুবরাজের পোষাক গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তাঁকে তাঁর পোষাক দিলেন। সিদ্ধার্থ শুধু পোষাক পবিবর্তনই করেন নি তিনি তাঁর কেশরাশিও মুণ্ডন করেছিলেন।

এই সংসারত্যাগী নবীন সন্ন্যাসী আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অদূরে একটি ঋষির কুটীর দেখতে পেলেন। ঋষির কাছে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে কপিলাবস্তু থেকে এই স্থানের দূরত্ব মাত্র বারো যোজন। এই খবর জেনে সিদ্ধার্থ অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো রাজধানী থেকে তিনি খুব বেশী দূর আসতে পারেন নি, হয়তো শাক্যরা অনুসরণ করে শীঘ্রই সেস্থানে উপস্থিত হবে এবং তার সন্ন্যাস যাত্রার পথে বাধা দেখা দেবে। তাই সিদ্ধার্থ ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করলেন না। দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করে তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি অনুপ্রিয় নামক গ্রামের এক আম্রকুঞ্জে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করলেন। এই গ্রামটী মল্লরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। সিদ্ধার্থ তাঁর গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে ইতিমধ্যে মনস্থির করেছেন। যে সব প্রশ্ন ও সমস্যা তাঁর মনে উদিত হয়েছিল একমাত্র জ্ঞানানুশীলন দ্বারা সেইসব সমস্যার সমাধান হতে পারে একথা তাঁর মনে হয়েছিল। সেইকালে রাজগৃহ এবং বৈশালী জ্ঞানানু-শীলনের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সুতরাং সিদ্ধার্থ বৈশালী অথবা রাজগৃহে গিয়ে উপযুক্ত গুরুর নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আট

সিদ্ধার্থের মনে যখন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তখন আর্য্যাবর্তের বহু সম্প্রদায় ও মনীষীদের মধ্যেও ধর্ম সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্খা তীব্র হয়ে উঠেছিল। বৈদিক ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি যারা করতে পারতেন তাঁদের সংখ্যা তখন মুষ্টিমেয়। সাধারণ লোকের কাছে সংস্কৃত তখন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সমাজের সকল স্তরে স্বীকৃত হলেও এই ব্যবস্থা অব্রাহ্মণ শ্রেণী নির্বিবাদে মেনে নেয়নি। সাধারণ লোকের কাছে ধর্ম তখন হয়ে উঠেছে জটিল যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের নামান্তরমাত্র। সমাজ জীবনে ক্রমশঃ বিক্ষোভের আলোড়ন দেখা যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু অব্রাহ্মণদের বিরোধিতা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় একদল লোকের মনে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করার ইচ্ছা তাদের মনে দুর্নিবার হয়ে উঠলো। এই সময়ে আর্য্যাবর্তের নানা স্থানে জ্ঞান ও তথ্য অনুশীলনের বহুতর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এই সকল কেন্দ্রের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল বৈশালী। বৈশালীতে রাজত্ব করতেন লিচ্ছবী বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা। লিচ্ছবী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সম্মত শাসন তন্ত্রের প্রচলন ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক থেকেও এই রাজ্য উন্নত ছিল। রাজধানী বৈশালী জনবহুল এবং বহু সুরম্য প্রাসাদ শোভিত নগরী বলে প্রাচীন সাহিত্যে কীর্তিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র রূপেও বৈশালী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। জৈন ধর্মের অন্যতম প্রবর্তক মহাবীরের প্রধান কর্মস্থল ছিল এই বৈশালী; সুতরাং সিদ্ধার্থ বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে একটা বৃক্ষের শাখা কেটে নিজের হাতেই ভিক্ষাপাত্র তৈয়ারী করলেন। বৈশালীতে সিদ্ধার্থ ইতিপূর্বে আসেন নি—তাঁর পরিচিতও কেউ ছিলেন না। নগরে প্রবেশ করে সিদ্ধার্থ রাজপথে

ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, সন্ন্যাসীর পোষাক আর ভিক্ষাপাত্র বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিদ্যাচর্চার বহু কেন্দ্র দেখতে পেলেন। যে কয়েকজন নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো তাঁদের কাছে থেকে তিনি জানতে পারলেন যে বৈশালী নগরের সর্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য অধ্যাপক ছিলেন কালাম গোত্রীয় আলার। বুদ্ধচরিতের মতে আলার ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক এবং সাংখ্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। কপিলাবস্তুতে শিক্ষালাভ কালে সিদ্ধার্থ সাংখ্য অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সাংখ্য বিষয়ে আরো গভীর জ্ঞানলাভ করলে তিনি তাঁর অন্তরে যে সব প্রশ্ন জেগেছিল যে সব প্রশ্নের সদুত্তর পাবেন। তিনি আলারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অনন্যমনা হয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, সাংখ্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান গভীরতর হলো। আরো একটি বিষয়ে তিনি আলারের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিব্বতী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গুরু আলারের কাছে সিদ্ধার্থ সর্বপ্রথম ধ্যানের প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু দর্শনের বহু জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করেও সিদ্ধার্থের অভিলাষ পূর্ণ হলো না। বৈশালীতে সিদ্ধার্থ অন্যান্য গুরুর কাছে নিয়মিত শিক্ষালাভ না করলেও মনে হয় যে তিনি বৈশালীর বিভিন্ন চিন্তানায়কেয় সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং নানা বিষয় নিয়ে তিনি একাধিক দার্শনিকের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু যে মহান সঙ্কল্প তাঁকে সংসার ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হলো না। অতঃপর সিদ্ধার্থ বৈশালী ত্যাগ করে রাজ-গৃহে উপস্থিত হলেন। রাজগৃহ ছিল মগধরাজ্যের রাজধানী পূর্বভারতের রাজ-নৈতিক ভারকেন্দ্র। কিন্তু রাজগৃহের সাংস্কৃতিক গৌরবও কম ছিল না। এখানেও বহুশিক্ষার্থী প্রতি বৎসর সমবেত হতেন এবং এই নগরে বহু কৃতবিদ্য অধ্যাপক বাস করতেন। স্বাধীন ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্র ছিল 'রাজগৃহ'। সিদ্ধার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে কিছুদিন উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে অতিবাহিত করলেন। কোনো কোনো বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে বৈশালী থেকে রাজগৃহে আসার পথে সিদ্ধার্থ কিছুকাল শ্রাবস্তী নগরীতে বাস করেছিলেন। বৈশালী ও রাজগৃহের মত শ্রাবস্তীও ছিল আর্য্যাবর্তের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক

কেন্দ্র। এইখানে সিদ্ধার্থ রামপুত্র নামে এক অধ্যাপকের কাছে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ দীর্ঘকাল শ্রাবস্তীতে বাস করেছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করে সিদ্ধার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। এইখানে নগরীর উপকণ্ঠে একটি নির্জনস্থান তিনি তাঁর বাসের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে স্নান সমাপ্ত করে শুচিবাস পরিহিত এই তরুণ শ্রমণ ভিক্ষা-পাত্র হাতে রাজপথে বহির্গত হতেন। তাঁর অপরূপ দিব্যকান্তি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। নগরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে, প্রয়োজনীয় অন্ন সংগৃহীত হলেই তিনি তাঁর বাসস্থানে ফিরে আসতেন। দিবস এবং রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তাঁর পাঠাভ্যাসে কেটে যেতো। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ সমস্যা সমাধানের কোনো সন্ধান খুঁজে পেলেন না। এই সময় তাঁকে দৈহিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, অনেকসময় তাঁকে অর্দ্ধাহারে এমন কি অনাহারে পর্য্যন্ত কাটাতে হতো। একবার সংগৃহীত ভিক্ষার অন্ন তাঁর কুটীরে যখন রন্ধন শেষে ভক্ষণে উদ্যত হলেন তখন দেখলেন সেই অন্ন আহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, মানুষের পক্ষে তা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি অন্ন পাত্রটি নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো তিনি সংসারের সকল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছেন বিষয় ভোগের বাসনা তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হওয়া উচিত, সুতরাং এ আহার্য্য গ্রহণে যদি অরুচি হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে তাঁর মন থেকে ভোগ বাসনার ইচ্ছা তখনও বিলুপ্ত হয় নি। তিনি অন্নপাত্রটি স্বস্থানে পুনঃ স্থাপনা করে পরম পরিতোষ সহকারে সেই খাদ্য গ্রহণ করলেন। এইভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে রাজগৃহে সিদ্ধার্থের জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো।

সিদ্ধার্থ যখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন তখন মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। পরবর্তী জীবনে সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন তখন বিম্বিসার বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই সিদ্ধার্থের সঙ্গে বিম্বিসারের পরিচয় ঘটেছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে শ্রমণ সিদ্ধার্থ যখন রাজগৃহের পথে ভিক্ষাসংগ্রহে বহির্গত হতেন তখন তাঁর

গৃহত্যাগের ভূমিকা

সৌম্য মূর্তি বহু নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বিম্বিসারও রাজপ্রাসাদের অলিন্দ থেকে এই তরুণ শ্রমণকে বহুবার দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তরুণ শ্রমণটী কে তা জানবার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন, কিন্তু কেউ এ বিষয় তাঁর কৌতুহল পরিতৃপ্ত করতে পারলো না। তখন বিম্বিসার একদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে শ্রমণকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু সিদ্ধার্থ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। যিনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন তিনি সাময়িক ভাবে হলেও কোনো গৃহীর আশ্রয় নেবেন না এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। তখন বিম্বিসার তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচর দিয়ে শ্রমণের অনুসরণ করে তিনি কোথায় অবস্থান করেন সেটা জেনে আসবার নির্দেশ দিলেন। যথাকালে অনুচর ফিরে এসে বিম্বিসারকে জানালেন যে শ্রমণ নগরের উপকণ্ঠে পাণ্ডব-গিরির এক নির্জন অংশে অবস্থান করেন। পরদিন বিম্বিসার জনকতক অনুচর সঙ্গে করে পাণ্ডবগিরিতে গিয়ে শ্রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রথমে বিম্বিসার শ্রমণকে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ভিক্ষু, আপনি কোন দেশ হইতে আগত হইয়াছেন? আপনার কোথায় জন্ম? আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন?"

তার উত্তরে শ্রমণ বল্লেন: "হে ধরণীপাল। শাক্যগণের সুসমৃদ্ধিশালী কপিলাবস্তু নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।"

বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে কষ্ট লাঘব করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ বিনয় অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। মগধরাজ বিম্বিসার তখন বল্লেন: "আপনার দর্শনলাভ করে আমি কৃতার্থ হইলাম। হে স্বামিন, যদি আপনি বুদ্ধত্বলাভ করেন তাহা হইলে আমি আপনার ধর্মের আশ্রয় লইব এবং আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছুকাল তখন রাজগৃহে অতিবাহিত করিবেন।" সিদ্ধার্থ মগধরাজের অনুরোধ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হলে বিম্বিসার প্রণাম করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

বৈশালী এবং শ্রাবস্তীতে সিদ্ধার্থ যে জ্ঞানানুশীলন করেছিলেন তার ফলে ধ্যানের প্রক্রিয়া তিনি সম্যকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ধ্যানের সপ্তম স্তর

তাঁর অধিগত হয়েছিল ; এই অবস্থায় ধ্যানীর মন থেকে বাসনার প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, সুখ দুঃখ ভেদাভেদ দূর হয়, শুদ্ধ এবং পবিত্র চিন্তার দ্বারা দেহ ও মন পূর্ণ হয়।

কিছুদিন পাণ্ডবগিরিতে অবস্থান করার পর সিদ্ধার্থ রাজগৃহের অদূরবর্তী গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করতে লাগলেন। এই স্থানটী অত্যন্ত নির্জন, এর প্রাকৃতিক পরিবেশও অত্যন্ত মনোরম। নির্জন সাধনার পক্ষে এই স্থানটী উপযুক্ত বিবেচনা করে সিদ্ধার্থ উপর্যুপরি কয়েকমাস এইস্থানে অবস্থান করলেন। ধ্যানের প্রক্রিয়া অভ্যাস করা ছাড়াও সিদ্ধার্থ এই নির্জন স্থানে গভীরতর মনোযোগ নিয়ে বিভিন্নতর শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। কিন্তু এতেও যে তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন গ্রহণ করেছিলেন সেই তত্ত্ব তাঁর কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল। তাঁর আকাঙ্খা পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পেলো না।

সিদ্ধার্থ যখন গৃধ্রকূটে অবস্থান করছিলেন তখন শুদ্ধোদন সংবাদ পেয়ে কপিলাবস্তু থেকে সেখানে সিদ্ধার্থের সেবার জন্য দুইশত অনুচর পাঠিয়েছিলেন। সুপ্রবুদ্ধও কয়েকজন অনুচর পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ সে অনুচরদের তাঁর সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিলেন না। পাঁচজন ছাড়া আর সকলেই স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন।

নয়

গৃধ্রকূটে অবস্থান করার পরেও যখন সিদ্ধার্থ চরম জ্ঞানের সন্ধান পেলেন না তখন তিনি রাজগৃহ পরিত্যাগ করে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান গয়ার উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। এই স্থানটী বিরাট বনস্পতিতে সমাচ্ছন্ন, নির্জন সাধনার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যে পাঁচজন অনুচর সিদ্ধার্থের সঙ্গী হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধার্থ সে অঞ্চলটি পরিভ্রমণ করে একটি স্থান নির্বাচন করলেন। এই স্থানের অনতিদূরে নৈরঞ্জনা নদী। সিদ্ধার্থ ভাবলেন জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা যদি সম্যক বোধিলাভ করা সম্ভব হতো তা হ'লে দীর্ঘ কাল পূর্বেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হতো। তাই এবার তিনি জ্ঞান চর্চার পরিবর্তে কৃচ্ছ্র সাধনের পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। নৈরঞ্জনা নদীর তীরে নির্জন বনমধ্যে একটি স্থানে উপবিষ্ট হয়ে সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগলেন বর্তমান যুগে জম্বুদ্বীপ নানা পাপ দ্বারা কলুষিত। কি করে জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পাপ মুক্ত করবো, কি করে তাদের আমি ধর্মকাজে অভিনিবিষ্ট করবো এটাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়। এইরূপ চিন্তা করে সিদ্ধার্থ দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমেই তিনি আস্ফালক ধ্যানের অনুষ্ঠান করলেন। এই ধ্যান অনুযায়ী তিনি তাঁর দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। দেহ এবং চিত্তের সব কয়টি বৃত্তি তিনি সংযত করলেন। এই ধ্যান নিমগ্ন থাকা কালে তাঁর মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র থেকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে বন্ধ হয়ে এলো। ক্রমে তাঁর কর্ণছিদ্রও রুদ্ধ হলো। মুখ, নাসিকা ও কর্ণ রুদ্ধ হওয়ার ফলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ঊর্দ্ধাভিমুখী হতে লাগলো। ক্রমে তাঁর শিরপিণ্ড ভেদ করে তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহির্গত হতে লাগলো। এই সময় তিনি আহার সংযত করেছিলেন। ক্রমে সমস্তদিনে তিনি একটির বেশী তণ্ডুল গ্রহণে বিরত হলেন। তাঁর দেহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। আস্ফালক ধ্যানের প্রক্রিয়া শেষ করে সিদ্ধার্থ 'ললিতব্যূহ' নামক

সমাধিতে মগ্ন হলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে দুশ্চর তপস্যা করেও সিদ্ধার্থ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন তিনি ভাবলেন কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারাও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। দেহরক্ষার জন্য যে সব স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য নিয়ম অবশ্য পালনীয় তিনি সেই সব নিয়ম পালন করে ধ্যান দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন বলে বদ্ধপরিকর হলেন। শরীরের ক্লেশ দূর হওয়ায় তাঁর চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলো। কিন্তু তাঁকে আহার গ্রহণ এবং কৃচ্ছ্র পরিত্যাগ করতে দেখে তাঁর সঙ্গীদের মনে হলো সিদ্ধার্থের আদর্শচ্যুতি ঘটেছে। তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল। নির্জন বনে সিদ্ধার্থ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গীরা চলে যাওয়ায় তিনি মনে এতটুকু বেদনা বোধ করলেন না। বরং তাঁর মনে হলো সঙ্গীহীন একক জীবনে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভুল ভাবে স্থির করতে পারবেন। কপিলাবস্তু ত্যাগ করে আসবার পর ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর জীবনে তিনি বহু বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কৃতবিদ্য বহু অধ্যাপকের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করে তুলেছিলেন। ধ্যানের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করার প্রক্রিয়াও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে ছিল। কৃচ্ছ্রসাধনের পথেও তাঁর অভিজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। তবু ছয় বৎসরকাল অক্লান্ত চেষ্টার ফলেও সাধনার পথে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না কিন্তু তাঁর অসাফল্য, মনে দৌর্বল্য আনার পরিবর্তে, তাঁর প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করে তুললো। ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির দ্বারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ তাঁর আকাঙ্খা ছিল না। তিনি চেয়ে ছিলেন সমগ্র প্রাণী জগৎকে দুঃখ, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি দিতে। তাঁর আকাঙ্খা ছিল সেই পরমপথের সন্ধান লাভ। সে পথে মানুষ বাসনাবিষ মুক্ত হয়ে জন্মান্তরের রথচক্রে নিষ্পেষিত হবে না সেই পথের সন্ধান তাঁর আদর্শ যেমন মহান তাঁর সঙ্কল্পও ছিল তেমনি দৃঢ়।

সঙ্কল্পের এই দৃঢ়তা পাথেয় করে সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি নূতন স্থান নির্বাচন করে পুনর্বার ধ্যান মগ্ন হলেন। ধ্যান নিবিষ্ট হওয়ার পূর্বে তাঁর মনোভাব বর্ণনা করে ললিতবিস্তর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে

ধ্যানাসন গ্রহণ করার পূর্বে সিদ্ধার্থ এই মর্মে মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্ত বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চ লিষ্যতে।"

অর্থাৎ এ আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক। এবং আমার ত্বক অস্থি ও মাংস এইখানে বিলীন হোক—কিন্তু সুদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এ আসন হইতে বিচলিত হইবে না।

বুদ্ধ-চরিত নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সিদ্ধার্থ যখন দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বোধিলাভের জন্য পুনরায় তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, তখন স্বর্গের দেবতা আর পৃথিবীর মানুষ সকলেই তাতে হর্ষলাভ করেছিলেন ; কিন্তু সৎধর্মের চিরশত্রু মার এতে প্রীতিলাভ করতে পারে নি। অশ্বঘোষের মতে সিদ্ধার্থ সমাধিমগ্ন হবার অল্পক্ষণ পরেই মার সিদ্ধার্থকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্কল্পচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল। উক্ত গ্রন্থকারের মতে বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামে মারের তিন পুত্র এবং রতি, প্রীতি এবং তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা মারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। কিন্তু শত প্রলোভনেও যখন সিদ্ধার্থকে সঙ্কল্পচ্যুত করা গেল না তখন মার প্রকাশ্যে তার অনুচরদের নিয়ে সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে তার সমগ্রশক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলো। বুদ্ধচরিত এবং অন্যান্য গ্রন্থে এই দ্বন্দ্বের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যকামী সিদ্ধার্থের দৃঢ়তার কাছে মারের সকল প্রচেষ্টা বিফল হলো। সিদ্ধার্থ অটুট সঙ্কল্প নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন। বহির্জগতের সংস্পর্শ থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে অবিচলিত ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলেন। কি ভাবে দিনের শেষে রাত্রির সমাগম হতো, আবার কি করে রাত্রির অবসানে সূর্যোদয় হতো, সেই জ্ঞানও তাঁর সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছিল। কথিত আছে যে এইসময় উরুবিল্ব গ্রামের সুজাতা নামে একটি গোপ বধূ সিদ্ধার্থকে পরমান্ন নিবেদন করেছিলেন।

বৌদ্ধসাহিত্যে সুজাতা উপাখ্যানটি বহু কীর্তিত। তপোক্লিষ্ট সিদ্ধার্থের দেহ যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, নির্জনবনে সিদ্ধার্থ যখন সঙ্গীহীন জীবন

যাপন করছিলেন তখন এই গোপবধূই তাঁর স্নেহস্পর্শে এই তপস্বীর জীবনের কাঠিন্য কিঞ্চিৎমাত্রায় হলেও লাঘব করেছিলেন।

সুজাতা কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত হলেও মর্মস্পর্শী। উরুবিল্ব গ্রামবাসী এক ভূস্বামীর কন্যা ছিলেন সুজাতা। গ্রামের অদূরে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক বিশাল অশত্থ বৃক্ষ ছিল। বহুকালের বৃক্ষ। গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল এই বৃক্ষেই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাস করেন। সুজাতা যখন বালিকামাত্র তখন মুকুলিকা বয়সের আবেগে একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি সমমর্য্যাদার কোনো যুবককে তিনি পতিরূপে লাভ করেন এবং তাঁর যদি একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে নিজের হাতে পরমান্ন প্রস্তুত করে তিনি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নিবেদন করবেন। যথাকালে সুজাতার স্বপ্ন সফল হলো। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি পরমান্ন প্রস্তুত করে তাঁর দাসী পুণ্যাকে পাঠালেন—গাছতলার উৎসর্গের জায়গাটী শোধিত করবার জন্য। পুণ্যা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলেন বৃক্ষতলায় ধ্যানমগ্ন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। পুণ্যা তাঁর সরল বুদ্ধিতে ভাবলে এই সেই বৃক্ষদেবতা—তিনি সুজাতার পরমান্ন গ্রহণ করার জন্য বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। পুণ্যা দ্রুত গৃহে ফিরে গিয়ে সুজাতার কাছে সংবাদটী জানালেন। বিশ্বাস করতে সুজাতার ভয় হয়—তবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলেন: 'পুণ্যা, যা বলছো তা সত্যি?' পুণ্যা প্রত্যুত্তরে বলে: 'হ্যাঁ দেবী, সত্য!' অধীর আগ্রহে সুজাতা দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে ত্রস্তগতিতে এগিয়ে চললেন বৃক্ষতল লক্ষ্য করে। তাঁর হাতে সোনার পাত্রে পরমান্ন, সোনার ভৃঙ্গারে সুগন্ধি জল। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে সুজাতা দেখলেন পুণ্যা সত্যিকথাই বলছে। বৃক্ষতলে ধ্যানশীল হয়ে যিনি উপবিষ্ট তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অনুপম স্বর্গীয় দ্যুতি। তাঁর দেহ কৃশ কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। সুজাতা ধীরে ধীরে সেই মূর্তির সম্মুখে প্রণত হয়ে তাঁকে পরমান্ন নিবেদন করলেন। দিব্যকান্তি পুরুষ সুজাতা-প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন। সোনার বাটিটি হাতে নিয়ে সিদ্ধার্থ গেলেন নৈরঞ্জনার তীরে এবং স্নানান্তে উঠে এসে পরম পরিতোষে সেই পরমান্ন ভোজন করলেন। দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশ দিন পরে গৌতমের এই

প্রথম আহার্য্য গ্রহণ। ভোজন শেষে সোনার বাটিটি নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন— আর সেই বাটিটি ভেসে চললো স্রোতের বিপরীত দিকে।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী, কিন্তু সুজাতার সেবার মাধুর্য্য যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করে বৌদ্ধ সাহিত্য কীর্তিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ যেদিন সুজাতা-প্রদত্ত পরমান্ন গ্রহণ করেছিলেন সেই দিনটি শুধু সিদ্ধার্থের জীবনে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় দিবস। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন এই সঙ্কল্প নিয়ে সিদ্ধার্থ যে আসন পরিগ্রহ করেছিলেন—আজ সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দীর্ঘকাল ধরে অনন্যমনা হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করে সিদ্ধার্থ ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। বাহিরের প্রকৃতির পরিবর্তন, মেঘ রৌদ্রের খেলা, শীতগ্রীষ্ম কোনো কিছুর সম্পর্কেই তিনি অবহিত ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল তাঁর জীবনে বহু আকাঙ্খিত সেই শুভমূহূর্ত সমাগত প্রায়। সিদ্ধার্থ যথানিয়মে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ক্রমে অপরাহ্নের সূর্য্য অস্তাচলগামী হলো, নৈরঞ্জনার জলে আর তার দুই তীরের অরণ্যে গাঢ় অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলো। সিদ্ধার্থের ধ্যানের বিরাম নেই। ক্রমে রাত্রির প্রথম যাম উপস্থিত হলো। এইবার সিদ্ধার্থের মন ও চৈতন্য আচ্ছন্ন করে দেখা দিল এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি। ক্রমে তাঁর চক্ষু দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হলো, তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎলাভ করলেন। রাত্রি গভীরতর হয়ে চল্লো, সিদ্ধার্থ তেমনি পূর্ববৎ ধ্যাননিবিষ্ট, রাত্রির মধ্যম যামে তাঁর পূর্বতন জীবনের অভিজ্ঞতা একে একে মনে উদিত হলো। তারপরেও অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে সিদ্ধার্থ ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ ভাবতে লাগলেন—তিনি উপলব্ধি করলেন জগতের দুঃখের উৎপত্তি। তিনি অনুভব করলেন অবিদ্যা হতে সংস্কার, সংস্কার হতে স্পর্শ, স্পর্শ হতে বেদনা, বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান, উপাদান হতে জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়ে থাকে। ক্রমে তিনি এই পরম সত্য উপলব্ধি করলেন যে, দেহধারী জীব যদি বাসনার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে, যদি তার মন থেকে সকল তৃষ্ণা অন্তর্হিত হয় তাহলে প্রাণী মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতে পারে। নির্বাণ লাভ

করলে জগতে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়, জন্মান্তরের শৃঙ্খল থেকে মানুষ অব্যাহতি লাভ করতে পারে।

রাত্রি অবসানে সিদ্ধার্থের মনে হলো তিনি যে সুদুঃসহ তপশ্চরণের পথ বেছে নিয়েছিলেন, যে একাগ্র সাধনায় দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন, যে মহাসত্যের সন্ধানের জন্য তিনি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, আত্মীয় প্রিয়জন পরিহার করেছেন, দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্র সাধনা করেছেন সেই পরম সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাই আজ দিব্যজ্ঞানে তাঁর অন্তরালোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তিনি পরমতত্ত্ব অধিগত হয়েছেন, তাই তিনি 'বুদ্ধ'—যে পথ অনুসরণ করলে 'বোধি' বা সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায় তিনি সেই পথের পথিকৃৎ—তাই তিনি 'তথাগত'।

বৌদ্ধ লেখকদের মতে সিদ্ধার্থ যে পরমক্ষণে সম্যক বোধি লাভ করেছিলেন সেই ক্ষণটিকে চিহ্নিত করবার জন্য বহু অসাধারণ নৈসর্গিক ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধ-চরিতে উল্লেখ আছে যে এই সময় আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল এবং অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা এই মহাপুরুষকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বুদ্ধের জীবনে যে ক'টি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যাঁর প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের গতি প্রভাবিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বোধিলাভের কাহিনীটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মহাভিনিষ্ক্রমণে যে বিরাট সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিয়েছিল, বোধিলাভ সেই সম্ভাবনার স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই ঘটনাটি শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিতে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তা নয়, সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতির সঙ্গে এই ঘটনাটী অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসে বহু 'নৃপতিকে মুকুট দণ্ড, সিংহাসন ভূমি' ত্যাগ করতে দেখা গেছে, যৌবনকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই একাধিক রাজপুরুষ নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতির মোহ কাটিয়ে নিরুদ্দেশ পথে যাত্রী হয়েছেন, তাদের সংখ্যাও ইতিহাসের হিসাবে নিতান্ত নগণ্য নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিদ্ধার্থ শুধু একজনই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের আত্মজিজ্ঞাসা অথবা সন্ন্যাসের মাধ্যমে পুণ্যার্জনের মোহ তাঁকে সংসার ত্যাগে প্রবৃত্ত করে নি। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তি। তিনি মানব

হিতৈষণার যে বিরাট আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করে সে আদর্শ চেয়েছিল সমগ্র প্রাণী জাতির মহামুক্তি এনে দিতে।

বোধি বৃক্ষতলে বহু আকাঙ্খিত বোধিলাভ করার পর বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে পারেন নি। তাঁর মনে যে সন্দেহ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াপাত করেছিল সেই সন্দেহের আজ অবসান হয়েছে। মনের ভারসাম্য তিনি ফিরে পেয়েছেন, মানব জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে দুঃখবাদী মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আজ সেই সন্দেহ ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছে। তাঁর মনে হলো যে মহান সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে সে সত্যের সন্ধান দান করা তাঁর কর্তব্য। পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো তিনি যে পরম সত্য উপলব্ধি করেছেন সে সত্য প্রচার করার পথে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুভূতির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম করা ভিন্ন তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে মানুষের মনে যে সংস্কার দৃঢ়মূল হয়ে আসছিল, সেই সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা অত্যন্ত কঠিন—একথাও তাঁর অজানা ছিল না। রক্ষণশীল সমাজের কাছে তাঁর উপলব্ধ সত্য বৈপ্লবিক বলে মনে হবে এ সম্ভাবনাও প্রবল ছিল। এই সব কারণে বুদ্ধ স্বভাবতঃই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে বোধিলাভ করার পরেও বুদ্ধ প্রথম সাতদিন বোধিদ্রুমতল ছেড়ে আর কোথাও যাননি। পরে তিনি সাত দিন নাগরাজ মুচিলিন্দর ভবনে অবস্থান করেন। পালি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি এই সময় নানাভাবে মুচিলিন্দ নাগকে সাহায্য করেছিলেন এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে নাগরাজ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। এর পরের সাতদিন বুদ্ধদেব অতিবাহিত করেন অজপালের ন্যগ্রোধমূলে। এই স্থানে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে উত্তরাধিকারের দাবীর উপর ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হওয়া নির্ভর করে না—নির্ভর করে শাস্ত্রজ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি, চারিত্রিক সংযম ও নিষ্ঠার উপর। ন্যগ্রোধমূলে বুদ্ধ সামাজিক প্রথা এবং জাতিভেদ

সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন বলে পালিগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই আলোচনা থেকে সামাজিক বিষয়ে বুদ্ধের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এই দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সেইরূপ আলোড়ন অত্যন্ত বিরল। অজপালের ন্যগ্রোধমূলে সাতদিন অতিবাহিত করার পর বুদ্ধ এক সপ্তাহ তারায়নমূলে বাস করেছিলেন—এই স্থানে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামে দুই বণিকের সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই দুই বণিক দক্ষিণাপথ থেকে বহু পণ্য দ্রব্য নিয়ে উত্তরাপথে যাচ্ছিলেন। পালিগ্রন্থে বলা হয়েছে যে বণিকেরা বুদ্ধের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে তারা আহার্য গ্রহণে সম্মত করেছিলেন। তিব্বতী ও সিংহলী গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে এই সময়ে স্বর্গের দেবগণ বুদ্ধকে প্রস্তর নির্মিত চারিটি ভিক্ষাপাত্র উপহার দিয়েছিলেন। ভল্লিক ও ত্রপুষের কাছে বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর উপলব্ধ সত্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই বুদ্ধের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ মতে এঁরা দু'জনেই বুদ্ধের আদিতম গৃহী উপাসক।

দশ
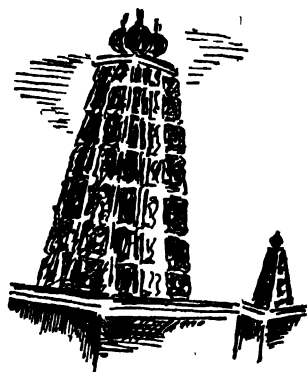
বোধিলাভ করার পর এইভাবে কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হবার পর বুদ্ধের মনের সন্দেহ আর সঙ্কোচ কেটে গেল। সে মহান সত্য তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন সেই সত্যকে তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন তাঁকে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাঁর মতবাদ সকলে গ্রহণ করবে কিনা সে সম্পর্কেও তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। তবুও তিনি স্থির করলেন যে পরম তত্ত্ব তিনি লাভ করেছেন সেটি সকলের অধিগম্য না করলে তাঁয় কর্তব্যের ক্রটী হবে। যখন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হয়ে গেল তখন বু দ্ধভাবলেন কার কাছে তিনি প্রথম এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করবেন। প্রথমেই তাঁর মনে পড়লো তাঁর পূর্বতন শিক্ষক আলার কালাম আর উদ্রক রামপুত্রের কথা। পাণ্ডিত্যের জন্য এঁরা দু'জন প্রসিদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ ভেবেছিলেন এঁরা দু'জন তাঁর ধর্মমতের প্রকৃত মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কিন্তু বুদ্ধ জানতে পারলেন যে এঁদের দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে তখন বুদ্ধের মনে পড়লো তাঁর পাঁচজন সঙ্গীর কথা যাঁরা দীর্ঘকাল একসঙ্গে থেকে বিদ্যাচর্চা ও তপশ্চরণ করেছিলেন। তিনি যখন উরুবিল্বতে এসেছিলেন তখন এরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন—এইখানে তিনি যখন কৃচ্ছসাধনে রত হলেন তখন এরা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁর সাফল্য কামনা করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন কৃচ্ছ্র পরিহার করে সুজাতা-প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করে পুনরায় ধ্যাননিবিষ্ট হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁর আদর্শচ্যুতি ঘটেছে এই ভেবে উরুবিল্ব থেকে প্রস্থান করেছিলেন। তারপর থেকে এদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। এইবার থেকে বুদ্ধ তাঁদের সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন এরা বারাণসীর অদূরবর্তী সারনাথে অবস্থান করছিলেন। তিনি স্থির করলেন সারনাথে গিয়ে এই পঞ্চ সঙ্গীর কাছে তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রবর্তন করবেন।

বুদ্ধ উরুবিল্ব ত্যাগ করে পদব্রজে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তাঁর সঙ্গে আজীবক নামে এক দার্শনিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। দু'জনের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হলো। তারপর পরস্পর বিদায় গ্রহণের পূর্বে আজীবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:—'হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে?'

বুদ্ধ বল্লেন:—

"বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশীকাং পুরীং
ধর্ম চক্রং প্রবর্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্তিতম্।"

অর্থাৎ আমি বারাণসী গমন করবো। কাশীকাপুরে গিয়ে সংসারে আমি অপ্রতিহত ধর্ম চক্র প্রবর্তন করবো।

উরুবিল্ব থেকে বারাণসীর দূরত্ব অল্প নয়! পদব্রজে যাত্রা, সুতরাং গন্তব্য স্থলে পৌছতে বুদ্ধের দীর্ঘকাল লেগেছিল। বুদ্ধ যত বারাণসীর নিকটবর্তী হচ্ছিলেন তত তাঁর মনের মধ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তনের আকাঙ্খা তীব্রতর হচ্ছিল। প্রথম জীবনে মানুষের দুঃখ কষ্টের যে চিত্র দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন আজ দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত তাঁর দৃষ্টির সামনে মুক্তিপথ প্রসারিত দেখতে পেলেন। সমগ্র মানব জাতিকে সে পথের সন্ধান না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্থির হতে পাচ্ছিলেন না। যথাসময়ে বুদ্ধ বারাণসীতে উপস্থিত হলেন—সেখানে লোকমুখে সংবাদ পেলেন যে তাঁর ভূতপূর্ব সঙ্গীরা তখন বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপত্তন মৃগদাবে অবস্থান করেছিলেন। বুদ্ধ সেখানে গেলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সেই পঞ্চভিক্ষু তাঁর দিব্যকান্তি দর্শনে ভাবলেন সিদ্ধার্থ কৃচ্ছ্র পরিহার করে আরামে জীবন যাপন করে দিব্যকান্তি লাভ করেছেন। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁকে তারা অভ্যর্থনা করবেন না এমন কি তাঁর সঙ্গে কথাও বলবেন না। তবে অনেককালের পরিচয় তাই তাঁরা সিদ্ধার্থের জন্য একখানা আসন পেতে রাখলেন—যদি ইচ্ছা হয় তিনি তাতে উপবেশন করতে পারেন। ক্রমে সিদ্ধার্থের দিব্যকান্তিমূর্তি নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো—কিন্তু পঞ্চভিক্ষু তেমনি নির্বিকার। আগন্তুক আরো কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর পূর্বতন সঙ্গীরা কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা

করার জন্য এগিয়ে আসছে না দেখে তিনি নিজেই ইঙ্গিতে তাদের কাছে যেতে বল্লেন। তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর আদেশ পালন করলেন। বুদ্ধ এগিয়ে গিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন—কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা আসনে উপবেন না করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুদ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশ তাঁদের আসন গ্রহণ করতে বললেন। তাঁরা উপবিষ্ট হলেন। বুদ্ধকে আসতে দেখে প্রথমে তাঁদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই ভাব তাঁদের মন থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেল। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁদের মন অনুশোচনায় ভরে উঠলো। যত তাঁর দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করছিলেন ততই তাঁদের মনে হচ্ছিল এই অনুপম মূর্তি কোনো ব্রতভঙ্গকারী বা সুখলিপ্সু পুরুষের হতে পারে না—ইনি নিশ্চয়ই কোনো দৈবশক্তির অধিকারী হয়েছেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হবার পর ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি আগন্তুককে পূর্ব প্রথা মত 'অয়ুষ্মান গৌতম' বলে সম্বোধন করলেন। তখন বুদ্ধ বল্লেন: হে ভিক্ষুগণ, আমাকে নাম ধরে বা আয়ুষ্মান বলে সম্বোধন করো না। আমি সম্বোধি লাভ করেছি আমি তথাগত, আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি—আমি উপদেশ দেব। আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলে তোমরা বহু আকাঙ্খিত মুক্তিলাভ করবে।"

ভিক্ষুরা বুদ্ধের কথায় সম্মত হলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। মুক্ত আকাশের তলায় সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে বুদ্ধের কণ্ঠ থেকে সেদিন যে বাণী উচ্চারিত হলো তা বৌদ্ধধর্মের মূল কথা। এই ঘটনাটি বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে পরিচিত। মহাভিনিক্রমণে যে সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিয়েছিল ধর্মচক্র প্রবর্তন তারই স্বাভাবিক পরিণতি। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসে এই ঘটনাটী মহাভিনিক্রমণের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চভিক্ষুর পরে যিনি বুদ্ধের বাণী গ্রহণ করে বুদ্ধ কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁর নাম যশ। তিব্বতী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে যশ ছিলেন বারাণসীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্র। যৌবনকাল থেকেই ইনি বিলাস ব্যসনের মধ্যে পালিত হয়েছিলেন কিন্তু অতিরিক্ত বিলাস ব্যসন ভোগ করে তাঁর মনে ক্রমশ বিরাগ উপস্থিত হলো। তিনি ভোগবিলাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় খুঁজছিলেন। সারনাথ থেকে বুদ্ধ এসেছিলেন বারাণসীতে তাঁর পাঁচজন

শিষ্য সহ। একদিন অপরাহ্নে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নদীর তীরে পাদচারণা করছেন এমন সময় নদীর অপর তীর থেকে যশ তাঁকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বল্লে: 'শ্রমণ, আমার বড় কষ্ট, আপনি আমায় রক্ষা করুন।' বুদ্ধ অঙ্গুলি নির্দেশে যশকে তার কাছে আসতে বললেন। যশ তার পাদুকা দু'খানি নদীর ধারে রেখে তৎক্ষণাৎ নদী পার হয়ে বুদ্ধের কাছে এলেন। বুদ্ধ পরম ধৈর্যভরে যশের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনলেন। তারপর তিনি যশের কাছে বসে বল্লেন তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তার কথা, তার ধর্মমত। শুনতে শুনতে যশের মনে ভাবান্তর এলো। বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে সে তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলো। এদিকে যশকে বাড়ীতে না দেখে তার সন্ধান করতে অনুচরেরা নানাদিকে বেরিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজন নদীর তীরে যশের পরিত্যক্ত পাদুকা দু'টি দেখতে পেয়ে যশের পিতাকে সংবাদ দিল। তিনি বহু সন্ধানের পর বুদ্ধের বাসস্থানে পুত্রকে দেখতে পেলেন। পিতা পুত্রকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন কিন্তু পুত্র তাতে সম্মত হলেন না। যশের পিতার সঙ্গে বুদ্ধের বহুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা হলো। তাঁকেও বুদ্ধ তাঁর ধর্মের কাহিনী শোনালেন। বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের কথায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর ধর্মে দীক্ষা নিলেন। যশ ভিক্ষু হয়ে বুদ্ধের কাছে অবস্থান করতে লাগলেন। যশের পিতা নিজগৃহে ফিরে গেলেন। যাবার সময় তিনি বুদ্ধকে পরদিন তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরদিন যথাসময়ে শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হলেন। আহারান্তে তাঁর কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা শুনে যশের মাতা এবং পত্নী দু'জনেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উপাসিকা নামে পরিচিত হলেন।

বারাণসীর ধনী সমাজে যশ ও তার পিতা অতিশয় প্রভাবশালী এবং সুপরিচিত ছিলেন। এই কারণে সেখানকার শ্রেষ্ঠী-সমাজে তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণ উপলক্ষে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। বুদ্ধ সেই আলোড়ন গ্রাহ্য না করে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বারাণসীর সকলের নিকট তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করে চললেন। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যে বারানসীর অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর শিষ্য সংখ্যা অর্দ্ধশত হয়ে দাঁড়ালো।

এই সময় বুদ্ধ সারনাথের মৃগদাবে অবস্থান করতেন, কখনও কখনও তিনি ধর্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে বারাণসীতে আসতেন। প্রতিদিন মৃগদাবে বহু দর্শনার্থীর ভীড় হতো। দূর দূরান্তর থেকেও ধর্মার্থি নরনারী বুদ্ধের উপদেশ শুনতে আসতেন। ক্রমে বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা যখন একশতের কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ালো তখন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের ডেকে বল্লেন—"ভিক্ষুগণ, তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, সংসারের প্রতি অনুকম্পার জন্য, দেব ও মানবের মঙ্গলের জন্য, হিতের জন্য, সুখের জন্য, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও। তোমাদের মধ্যে এক এক জন এক এক দিকে যাও।" তিনি তাদের আরো বল্লেন—"হে ভিক্ষুগণ, এই যে ধর্ম, যাহা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, যাহা কৈবল্যময় পরিশুদ্ধ ও ব্রহ্মচর্য্য, সেই ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া, প্রকাশ করিয়া প্রচার কর।" তাঁর একথা শুনে তাঁর শিষ্যেরা নানাদিকে বেরিয়ে পড়লেন। তখন পদব্রজে ছাড়া যাতায়াত সম্ভব ছিল না। তাঁরা পূর্ব ভারতের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে নরনারী নির্বিশেষে সকলের কাছে বুদ্ধের উপদেশ বিতরণ করতে লাগলেন। তাঁদের কথা শুনে বহুলোক বুদ্ধের শরণ নিতে চাইলেন। কিন্তু এঁরা ধর্ম-প্রচারেরই অধিকারী ছিলেন—এঁদের দীক্ষাদানের কোনো অধিকার ছিল না। যাঁরা বুদ্ধের ধর্ম-গ্রহণ করতে চাইতেন তাঁদের সারনাথ মৃগদাবে এসে স্বয়ং বুদ্ধের কাছে থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু ক্রমে যখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা নির্ভরযোগ্য এবং বহুদর্শী তাঁদের দীক্ষাদানের অধিকার দিলেন। এর ফলে বৌদ্ধধর্মে যাঁরা দীক্ষিত হতে চাইতেন তাঁদের সকলকে আর মৃগদাবে আসতে হতো না। দীক্ষার্থীকে চীর ধারণ করে ভিক্ষাপাত্র হাতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হতো আর দীক্ষা গ্রহণ কালে "আমি ধর্মের শরণ লইলাম" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হতো।

এগার

রাজগৃহে আসবার পর প্রথম বর্ষাঋতু বুদ্ধ সারনাথে অতিবাহিত করেছিলেন। বর্ষাঋতুতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত কষ্টসাধ্য ছিল—তাই বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যরা এই ঋতুতে একই স্থানে বাস করতেন। বর্ষার অবসানে আবার প্রচারকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ধর্ম-প্রচারের জন্য নানাস্থানে বহির্গত হতেন। সারনাথে প্রথম বর্ষাঋতু যাপনের পর প্রচারকরা বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে যাবার পর বুদ্ধ নিজে বারাণসী ত্যাগ করে উরুবিল্ব অভিমুখে যাত্রা করলেন। উরুবিল্ব গ্রামের নির্জন নদীতীর বুদ্ধের বড় প্রিয়স্থান। এখানকার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিদ্রুমতলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সুতরাং এখানে ফিরে এসে বুদ্ধের খুব ভালো লাগলো। প্রথম দিনকয়েক তিনি বোধিদ্রুমের কাছাকাছি একটি নির্জন স্থানে বাস করলেন। তারপর যখন স্থানীয় লোকেরা তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পারলেন সেই নির্জন নদী তীরে প্রতিদিন বহুলোকের সমাগম হতে লাগলো। এইসময়ে কপিলাবস্তু থেকে দেব নামে এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বুদ্ধ-দর্শনে এসেছিলেন। বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশ শুনে এই ব্রাহ্মণ দম্পতি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এর কিছুকাল পরে উরুবিল্ব গ্রামের নন্দা ও নন্দাবালা নামে দুই নারী বুদ্ধের গৃহ উপাসিকা হলেন। কিন্তু উরুবিল্বে যারা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় তিনজন ব্রাহ্মণ ভ্রাতা। এঁরা তিনজন জটিল বা জটাধারী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রবিদ্ এবং বিভিন্ন গুণের অধিকারী বলে এদের সুনাম ছিল। বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির খ্যাতি এদের কাছে পৌঁছেছিল। বোধ হয় বুদ্ধের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য এঁরা তিনজন তাঁর সঙ্গে উরুবিল্ব গ্রামে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এঁদের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বুদ্ধের সঙ্গে বহু জটিল বিষয় নিয়ে বহুক্ষণ ধরে এঁদের বাদানুবাদ

মহাভিনিষ্ক্রমণ

হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তর্কে পরাস্ত হয়ে এরা বুদ্ধের কাছে নতি স্বীকার করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁদের মত বিদ্বান ও খ্যাতিমান ব্যক্তিরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় চতুর্দিকে বুদ্ধের প্রভাব অনেকখানি বেড়ে গেল এবং বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলো।

বুদ্ধ সব শুদ্ধ তিনমাস উরুবিল্বতে অতিবাহিত করেছিলেন। এরপর তিনি গয়াশীর্ষ পাহাড়ে গেলেন। এইস্থানে বুদ্ধ যে ক'দিন অবস্থান করেছিলেন সে ক'দিন পার্শ্ববর্তী স্থান এমনকি দূরতর প্রদেশ থেকেও বহু নরনারী তাঁর উপদেশ শুনতে আসতেন। এই সময়ে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সিংহলীগ্রন্থে অগ্নি উপদেশ নামে লিপিবদ্ধ আছে। গয়াশীর্ষ পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থান করার পর বুদ্ধ রাজগৃহ নগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। নানাস্থান ভ্রমণ করে বুদ্ধ রাজগৃহের উপকণ্ঠে যষ্ঠীবন নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। রাজধানীর অদূরে অবস্থিত বলে স্থানটী অপেক্ষাকৃত নির্জন ছিল। এই কারণে বুদ্ধ এইস্থানে বাস করবেন বলে স্থির করলেন। বুদ্ধের উপস্থিতির কথা বারাণসীতে ছড়িয়ে পড়লো। এতদিন সকাল সন্ধ্যায় রাজধানী থেকে বহু নরনারী বুদ্ধদর্শনে আসতেন, তাঁর উপদেশ শুনতেন। অনেকে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতেন। বুদ্ধের উপস্থিতির কথা মগধরাজ বিম্বিসারের কানে গেল। ইতিপূর্বে পাণ্ডব পর্বতে এঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন নি। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে মুক্তিলাভেচ্ছু হয়ে তিনি কপিলাবস্তু ছেড়ে রাজগৃহে অবস্থান করেছিলেন। শ্রমণ সিদ্ধার্থ যখন রাজগৃহের রাজপথে ভিক্ষাপাত্র হাতে বহির্গত হতেন তখনই বিম্বিসারের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে দু'জনকার মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সিদ্ধার্থ মগধ রাজের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে তিনি যদি বুদ্ধত্ব লাভে সমর্থ হন তাহলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হলেও তিনি রাজগৃহে অবস্থান করবেন। সম্ভবতঃ এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য গয়াশীর্ষ থেকে বুদ্ধ রাজগৃহে এসেছিলেন। বুদ্ধ শিষ্য-পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট—এমনি সময়, মগধ-রাজ তাঁর দর্শনে এলেন। দর্শনার্থীরা যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন

বিম্বিসার সেইখানে তাদের সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হয়ে বুদ্ধের উপদেশ বাণী শ্রবণ করলেন। উপদেশ শ্রবণের পর যখন দর্শনার্থীরা যার যার স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিম্বিসার বুদ্ধেব সম্মুখে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যেন পরদিন শিষ্যদের সহ বুদ্ধ রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন। বুদ্ধ মগধ-নৃপতির এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। পরদিন রাজপ্রাসাদে বুদ্ধ এবং ভিক্ষুদের পরম যত্নে রাজা নিজে আহার্য পরিবেশন করলেন। ভোজন পর্ব সমাধা হলে বিম্বিসার বুদ্ধকে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যদি বাজধানীর অদূরে অবস্থিত বেণুবন নামে প্রমোদ উদ্যান গ্রহণ করেন তাহলে তিনি অত্যন্ত অনুগৃহীত হবেন। এই স্থানটী বাজধানীর অদূরে, এর পরিবেশ নির্জন এবং স্থানটী সাধন ভজনের অত্যন্ত উপযোগী। বুদ্ধ সানন্দে এই অনুরোধ পালনে সম্মত হলেন। তখন বিম্বিসাব স্বর্ণময় ভৃঙ্গার থেকে বুদ্ধের হাতে জল ঢেলে দিয়ে বল্লেন: ভগবন! এই বেণুবন উদ্যান আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করলাম। এই বেণুবন বিহারটী সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বেণুবন বিহাবেব পূর্বে নাম ছিল কালান্তক নিবাস বেণুবন। বিম্বিসার যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন যে জায়গা জুড়ে এই বনটী অবস্থিত ছিল সেই স্থানটী তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ঐ স্থানের মালিককে তিনি অনুরোধ কবেছিলেন বনটী যেন তাঁর কাছে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু বনের মালিক তাব প্রস্তাবে সম্মত হলো না। তারপর কয়েক বছর পর বিম্বিসার রাজা হয়ে জোর করে সেই স্থানটী অধিকার করে নিলেন। তখন মালিক শোকে দুঃখে প্রাণত্যাগ করলো—কিন্তু ঐ স্থানটীর প্রতি তাব মায়া এত বেশী ছিল যে মৃত্যুর পরে সে একটি বিষধর সাপ হয়ে সেই বনেই বাস করতে লাগলো। জন্মান্তরের পরেও তার পূর্বজন্মের ক্রোধ কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি। সাপ হয়ে সে সুযোগ খুঁজছিল যে কি করে রাজার প্রাণনাশ করবে। একদিন নৃপতি বিম্বিসার তাঁর মহিষীদের সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন; কিছুক্ষণ পবে পরিশ্রান্ত হয়ে সেখানে বিশ্রাম করতে গিয়ে নিদ্রিত হয়ে পড়েন। এমন সময় সেই সাপটি তাঁকে দংশন করার উদ্দেশ্যে ফণা উদ্যত করে অগ্রসর হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

দংশন করা সম্ভব হলো না। যে গাছের তলায় রাজা নিদ্রিত ছিলেন সে গাছে থাকতো কতকগুলি কালান্তক পক্ষী। তারা সাপকে দেখে এত চীৎকার করলো যে রাজা ও রাণীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন সবাই মিলে সাপটিকে মেরে ফেললেন। কালান্তক পক্ষীদের কৃপায় রাজার জীবন রক্ষা হয়েছিল সেইজন্য রাজা সেই বনে অনেকগুলো বাঁশ গাছ লাগিয়ে দিলেন যাতে পাখীদের থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা না হয়। সেই থেকে সেই বনের নাম হয়েছিল কালান্তক বেণুবন।

এরপর বুদ্ধ যখন রাজগৃহে আসতেন তখন অধিকাংশ সময়ে তিনি এই বেণুবন বিহারে অবস্থান করতেন। বুদ্ধের জীবনের বহু স্মৃতি এই বেণুবন বিহারের সঙ্গে জড়িত আছে। রাজগৃহ ছিল আর্যাবর্তের সবচেয়ে জনবহুল সহর। বুদ্ধদেব বেণুবনে বাস করার পর থেকে রাজগৃহের বহু ভারতীয় এবং বহু বিদেশী অধিবাসী বুদ্ধ দর্শনে আসতেন আর অসংখ্য নরনারী তাঁর উপদেশে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। এই সময়ে যারা বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধের শিষ্য রূপে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের। রাজগৃহ নগরের অদূরবর্তী নালন্দা গ্রামে কোলিত ও উপতিষ্য নামে দু'জন ব্রাহ্মণ যুবক বাস করতেন। এঁরা অল্প বয়সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের গুরু ছিলেন সঞ্জয় নামে এক আচার্য। বুদ্ধের উপস্থিতির কথা এঁরা দু'জনেই শুনতে পেয়েছিলেন এবং সেই অঞ্চলের বহু নরনারী বুদ্ধের উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এ সংবাদ তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। পালি ও তিব্বতী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে একদিন উপতিষ্য বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য অশ্বজিৎকে দর্শন করেন এবং তাঁর কাছে থেকে বুদ্ধ সম্পর্কে নানা কথা শুনে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এরপর কোলিত বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কালক্রমে উপতিষ্য এবং কোলিত এই দুইজন সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন নামে পরিচিত হলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসে বুদ্ধের পরই এই দুই ভিক্ষুর স্থান। কোলিত এবং উপতিষ্যের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যুবক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন—এ সংবাদ সাধারণের

মধ্যে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বভারতের সর্বত্র বুদ্ধের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। প্রতিদিন বুদ্ধ শতশত লোককে দীক্ষা দিতেন তাই নয়, ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি দেশের নানা স্থানে যে সব প্রচারক পাঠাতেন—তারাও তার সম্মতি নিয়ে সঙ্ঘে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিকে ভিক্ষু অথবা উপাসক রূপে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার অনুমতি দিতেন। এই ভাবে বুদ্ধ এবং তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে অল্প কাল মধ্যে বুদ্ধের অনুগতদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো।

বার

সিদ্ধার্থ যেদিন গৃহত্যাগ করেন সেই দিন থেকে কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে যে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল বহুকাল পর্যন্ত তা অন্তর্হিত হয় নি। শুদ্ধোদন যন্ত্রচালিতের মতন শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন কিন্তু কোনো কাজেই তার উৎসাহ নেই। সিদ্ধার্থ চলে যাবার অব্যবহিত পরেই তিনি কপিলাবস্তু থেকে অনুচর ও দাসদাসী পাঠিয়ে পুত্রের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ কোনো দাসদাসী গ্রহণে সম্মত হন নি। এরপর সিদ্ধার্থ যখন দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে বোধিগয়ায় ধ্যানে মগ্ন, তখন একদিন কপিলাবস্তুতে এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে সিদ্ধার্থের মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে সমস্ত রাজধানী শোকে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু যথাকালে আবার সংবাদ পাওয়া গেল যে সিদ্ধার্থের মৃত্যু ঘটে নি বরং তিনি তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। রাজধানী এবং রাজ্যের সকলে এ সংবাদে পরম আশ্বস্ত হলেন। পুত্র জীবিত আছে জেনে শুদ্ধোদনেরও আনন্দের সীমা রইল না। শুদ্ধোদনের বয়স হয়েছে, তাঁর শরীর ও মন দুই-ই দুর্বল, তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা মৃত্যুর পূর্বে একবার পুত্রমুখ দর্শন করবেন। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক অনুচর তাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছা বহন করে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে কিন্তু তাঁদের দৌত্য সফল হয় নি। প্রতিবারই বুদ্ধ ভদ্রভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েও শুদ্ধোদনের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হয় নি—বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রাজার মনের অবস্থা জানতে পেয়ে তাঁর এক অনুচর বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শেষ চেষ্টা করার অনুমতি চাইলেন। এই অনুচরটির নাম কালুদায়ী। সিদ্ধার্থের বাল্যসহচরদের মধ্যে এঁর সঙ্গে যুবরাজের সব চেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল। একবার এক বিষধর সর্প তাকে দংশন করেছিল, তারফলে তাঁর সমস্ত দেহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করায়

সাধারণের কাছে সে কালুদায়ী নামে পরিচিত ছিল। কালুদায়ী বুদ্ধকে কপিলাবস্তু আসবার আমন্ত্রণ জানাবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে রাজগৃহে পৌঁছে কালুদায়ী বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বহু বৎসর পরে দু'জনে সাক্ষাৎ হলো। বুদ্ধ সাধারণ ভাবে কপিলাবস্তু সম্পর্কে দু'চারটি কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু রাজপরিবারের কথা বিস্তারিত ভাবে জানতে চাইলেন না। বন্ধুর সঙ্গে দু'চারটী কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর বুদ্ধ সমবেত শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের উপদেশ বিতরণ করতে লাগলেন। কালুদায়ী সভার এক কোণে নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন। বুদ্ধের উপদেশ বাণী তার অন্তর স্পর্শ করলো। তিনি তন্ময় হয়ে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ শুনতে লাগলেন। যতক্ষণ উপদেশ ধারা বর্ষিত হচ্ছিল ততক্ষণ কালুদায়ীর মানস চক্ষুতে কপিলাবস্তুর ছবি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন, সে পৃথিবীতে থাকবে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব, সেখানে থাকবে না কোনো অশান্তি, হিংসা; জাতিতে জাতিতে দ্বেষ ও বৈরীভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হবে—মৈত্রী ও সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানুষ পৃথিবীতে রচনা করবে নতুন স্বর্গ।

কালুদায়ী বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল কপিলাবস্তুতে ফিরে না গিয়ে তিনি বুদ্ধের সঙ্গেই আজীবন যাপন করবেন। কিন্তু বুদ্ধ তাতে সম্মত হলেন না, তিনি তাকে কপিলাবস্তুতে ফিরে যেতে বললেন। কালুদায়ী বুদ্ধ'র কাছে বিদায় নিয়ে কপিলাবস্তুতে ফিরে গেলেন—পরিধানে চীর বস্ত্র আর হাতে ভিক্ষাপাত্র। আরো সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটি মহান প্রতিশ্রুতি—বুদ্ধ শুদ্ধোদনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেছেন! অদূর ভবিষ্যতে তিনি কপিলাবস্তু দর্শনে যাবেন কিন্তু একটি সর্তে—তিনি রাজপ্রাসাদে, এমন কি রাজধানীর কোন গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না। তিনি শাক্য নায়ককে অনুরোধ জানালেন যেন নগরের উপকণ্ঠে তাঁর এবং শিষ্যদের বাসের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করা হয়। শুদ্ধোদন কালুদায়ীর মুখে এ কথা শুনে পরম প্রীতিলাভ করলেন এবং উৎসাহের সঙ্গে কপিলাবস্তুর অদূরে ন্যগ্রোধ আরাম নামে একটি বৃহদায়তন বিহার নির্মাণে উদ্যত হলেন। বেণুবন বুদ্ধের প্রথম

বিহার এবং এই বিহারের আদর্শে শাক্যনায়ক কপিলাবস্তুর উপকণ্ঠে নতুন বিহার নির্মাণে উদ্যত হলেন।

বুদ্ধ রাজগৃহে শীতবনে অবস্থান করছিলেন এমন সময় তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন সুদত্ত নামে শ্রাবস্তীর এক ধনী শ্রেষ্ঠী। প্রতিদিন বহু দর্শনার্থী শীতবনে সমবেত হতেন। সুদত্ত যেদিন বুদ্ধের দর্শনার্থী হয়ে এসেছিলেন সেদিনও সেখানে বহুলোকের সমাগম হয়েছিল। করুণাময় বুদ্ধ বহুক্ষণ ধরে তাদের সকলকে তাঁর অমূল্য উপদেশ বাণী বিতরণ করলেন। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রোতার দল সেই অপূর্ব কথন শ্রবণ করলো। সভায় তিলধারণের স্থান নেই —কিন্তু কি অপরূপ প্রশান্তি, নিস্তব্ধতা। বুদ্ধের বাণী সভায় একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চললো। কখনও গভীর আবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ উত্তোলিত, কখনও বিচার বিশ্লেষণের আলোকে উজ্জ্বল। শ্রোতৃবর্গ চিত্রার্পিতের মত নির্বাক বিস্ময়ে উপবিষ্ট। তাদের মুখে নতুন আশার আলো, চোখে করুণার দরবিগলিত ধারা। ইতিপূর্বে সুদত্তর বুদ্ধের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য হয় নি। এতকাল ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে অর্থ উপার্জনের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাকে তিনি মনে স্থান দিতেন না। কিন্তু আজ সুদত্তর চোখের সামনে নতুন জগৎ উন্মুক্ত হলো। সভার শেষে সুদত্ত বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন তিনি যেন একবার শ্রাবস্তী নগরে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রাবস্তী কোশলরাজ্যের রাজধানী, রাজগৃহের মতই এর সমৃদ্ধি ও লোকবল। বুদ্ধ কিছুদিন পূর্ব থেকে শ্রাবস্তী দর্শনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই সুদত্তের প্রস্তাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। কিন্তু সুদত্তের কাছে তিনি একটি মাত্র কথা জানতে চাইলেন—শ্রাবস্তীতে তাঁর বাসোপযোগী কোনো স্থান আছে কি না। রাজধানীর মত জনাকীর্ণ স্থান তাঁর বাসের অনুপযোগী। এই কথা জানাতে সুদত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বুদ্ধকে বল্লেন: 'আপনি যদি অনুমোদন করেন তাহলে আমি আপনার এবং ভক্তদের বাসোপযোগী একটা নতুন বিহার নির্মাণের সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি।' বুদ্ধ সানন্দে সুদত্তর এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে সুদত্ত শ্রাবস্তীতে ফিরে গেলেন।

শ্রাবস্তী এবং তার সমীপবর্তী সকল স্থানের সঙ্গেই সুদত্তর ঘনিষ্ঠ পরিচয়

ছিল। তিনি সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে যে স্থানটী নির্বাচন করেছিলেন সেটী ছিল যুবরাজ জেত-এর উপবন। সুদত্ত স্থানটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক বলে জেতের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন। কিন্তু জেত প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। সুদত্ত এতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে জেতের কাছে পুনরায় প্রস্তাব করে পাঠালেন যে ঐ স্থানটির জন্য তিনি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন। পাছে জেত এবারেও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই ভয়ে সুদত্ত বলে পাঠালেন যে ঐ অঞ্চলের সমস্ত ভূমি যদি সোনার পাতে ঢেকে দিলে যুবরাজ জেত সেটি বিক্রয় করতে সম্মত হন তাহলে তিনি সোনার পাত দিয়ে সমস্ত জেতবন অঞ্চল ঢেকে দিতেও সম্মত আছেন। জেতের কৌতূহল হলো—তিনি শ্রেষ্ঠীর কথায় সম্মত হলেন। পরদিন থেকে সুদত্তর নির্দেশ মত শ্রমিকরা রাশি রাশি সোনা এনে সেই জায়গাটি ঢেকে দিতে আরম্ভ করলো। সমস্ত স্থানটি প্রায় ঢাকা হয়ে গিয়েছে এমন সময় সংবাদ পেয়ে জেত সেই স্থানে উপস্থিত হলেন এবং সুদত্তর বদান্যতা দেখে এতদূর মুগ্ধ হলেন যে তিনি যে অংশটী তখনও সোনার পাত দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়নি সেই অংশে নিজ ব্যয়ে একটি ভিক্ষু-আবাস নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনতিকাল মধ্যে যুবরাজ জেতের দাক্ষিণ্যে এবং সুদত্তর অর্থানুকুল্যে সেই জনশূন্য প্রান্তরে গড়ে উঠলো বিরাট-আয়তন বিহার। এতে ষাটটি বৃহৎ কক্ষ আর সমান সংখ্যক ক্ষুদ্রতর কক্ষ। যে কক্ষটি বুদ্ধের বাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল তাকে বলা হতো গন্ধকুটী। বুদ্ধ সুগন্ধি ভালবাসতেন এই কারণে সুগন্ধি কাষ্ঠ দিয়ে এই কক্ষটি নির্মিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের বাসকক্ষ ছাড়া এই বিরাট-আয়তন বিহারে ছিল সভাকক্ষ, ভাণ্ডার গৃহ, রন্ধনশালা, স্নানকক্ষ, পুষ্করিণী ইত্যাদি। বহুলোক অনেকদিন ধরে একসঙ্গে বাস করতে গেলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন তার সব ক'টি ব্যবস্থাই এই বিহার নির্মাণকালে অবলম্বিত হয়েছিল। বিহারের নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুদত্ত বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজগৃহ ত্যাগ করে শ্রাবস্তী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন তাঁর ভক্ত, ভিক্ষু আর গৃহী উপাসকরা। শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে বিরাট জনতা বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জানালো। বিহারে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ অল্পক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর সভাগৃহে তিনি তাঁর দর্শনপ্রার্থী

এবং শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। বহুক্ষণ ধরে তিনি সহজবোধ্য ভাষায় তাঁর উপদেশ বিতরণ করলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী পরম শ্রদ্ধায় তাঁর অমৃতোপম বাণী শ্রবণ করে দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সভার শেষে সুদত্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বর্ণ-ভৃঙ্গার থেকে বুদ্ধের হাতে জল ঢেলে বিহারটিকে দান করলেন। বুদ্ধ সানন্দে সেই দান গ্রহণ করে বিহারটির নামকরণ করলেন জেতবন বিহার বলে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তৃতীয় বর্ষা বুদ্ধ এই জেতবন বিহারে যাপন করলেন। কালক্রমে এই বিহারটি বৌদ্ধধর্মের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠলো। গয়া, সারনাথ, রাজগৃহ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসে সমধিক কীর্তিলাভ করেছে কিন্তু শ্রাবস্তীর সঙ্গেও বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মের বহু স্মৃতি জড়িত আছে। বুদ্ধ এই অঞ্চলে জীবনের শেষ পঁচিশ বর্ষ যাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন বুদ্ধের উপদেশ সঙ্কলিত হয় তখন অধিকাংশ উপদেশের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি এই উপদেশ বিতরণ করা হয়েছিল। এইভাবে শ্রাবস্তীর বিহারটি বুদ্ধ ভক্তদের কাছে একটি পরম পবিত্র স্থান বলে গণ্য হয়ে আসছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে এই বিহারটিকে অনাথপিণ্ডদ আরাম নামেও বর্ণনা করা হয়েছে।

তের

কিছুকাল জেতবন বিহারে অবস্থান করার পর বুদ্ধ শিষ্যদের সঙ্গে করে রাজগৃহে পৌছবার কিছুকাল পরেই তাঁর কপিলাবস্তু যাবার আমন্ত্রণ এলো। ইতিপূর্বে কালুদায়ীর কাছে বুদ্ধ যে সর্তে কপিলাবস্তু যেতে সম্মত আছেন জানিয়েছেন—শুদ্ধোদন সেই সব সর্ত গ্রহণ করে রাজধানীর অদূরে জেতবন বিহারের আদর্শে ন্যগ্রোধ আরাম নামে একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধ তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এবার সশিষ্য কপিলাবস্তু অভিমুখে যাত্রা করলেন। দীর্ঘপথ—এই পথ দিয়ে একদিন রাজধানী পরিত্যাগ করে তিনি পরম সত্যের সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ সেই পথ দিয়ে তিনি জন্ম-ভূমিতে জন্মস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। যে সকল জনপদ অতিক্রম করে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই সকল জনপদ তাঁর পূর্বপরিচিত। পথের দুই ধারে প্রকৃতি যে অনুপম সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার নিঃশেষে বিতরণ করে রেখেছিলেন, বুদ্ধের দৃষ্টি বার বার সেইদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। অতীত জীবনের বহুস্মৃতি ভীড় করে তাঁর মানসপটে উদিত হতে লাগলো। এই দীর্ঘপথ পরিক্রমায় যে সব স্থানে রাত্রিবাস ও বিশ্রামের জন্য তাঁকে অরস্থান করতে হয়েছিল সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা তাঁর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই গৃহী উপাসক অথবা ভিক্ষুরূপে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। এই-ভাবে ধর্ম প্রচার করতে করতে বুদ্ধ শাক্যরাজ্যের উপকণ্ঠে উপনীত হলেন। পূর্বাহ্নে তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে অগণিত শাক্য নরনারী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য রাজ্যসীমান্তে সমবেত হয়েছিলেন। কপিলাবস্তুতে এরকম দৃশ্য আর কোনোদিন দেখা যায় নি। রাজ্যের সমস্ত লোক সেদিন তাদের ঘর বাড়ী কাজকর্ম ছেড়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে মিলিত হয়েছিল। দূর থেকে বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যদের দেখে বিরাট জনসমুদ্র জয়ধ্বনি করে উঠলো—'জয় ভগবান তথাগতের জয়'। শুদ্ধোদন বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যদের

বাসের জন্য যে বিহার নির্মাণ করেছিলেন বুদ্ধ সেখানে আশ্রয় নিলেন। যে বিরাট জনতা বাইরে অপেক্ষা করছিল তারা শুধু তাঁর দর্শনলাভেই সন্তুষ্ট নয়—তারা তাঁর উপদেশ শোনার জন্যও আগ্রহশীল ছিল। বুদ্ধ সাধ্যমত কোনো প্রার্থীকেই বিমুখ করতেন না। কপিলাবস্তুর জনসাধারণের আকাঙ্খা ওঔৎসুক্য দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ সাধারণের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি উপদেশ বিতরণ করলেন। তাঁর ভাষণ সমাপ্ত হবার পর সেই জনতা ক্রমশঃ অপসৃত হলো। নির্জন প্রান্তরে বিরাট বিহারে বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যরা রাত্রির জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

বুদ্ধ ইতিপুর্বে কালুদায়ীর মাধ্যমে শুদ্ধোদন এবং অন্যান্য শাক্যনায়কদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে তিনি কপিলাবস্তু পরিদর্শন করতে সম্মত আছেন কিন্তু তিনি রাজপ্রাসাদে অথবা রাজধানীর কোনো গৃহে অবস্থান করবেন না। এই কারণে বুদ্ধের আত্মীয় পরিজনেরা তাঁকে বিহার ছাড়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করার অনুরোধ জানান নি। পরদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য এবং প্রার্থনার পর বুদ্ধ কয়েকজন শিষ্য সহ রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। যেদিন যুবরাজের পোষাকে সিদ্ধার্থ কণ্টকের পিঠে আরোহন করে রাত্রির দ্বিতীয় যামে প্রাসাদ থেকে সকলের অলক্ষ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন তারপর দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম তাঁর কপিলাবস্তু দর্শন। গয়ায় বোধিলাভ করার পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হয়তো মনের অলক্ষ্যে কপিলাবস্তুর দৃশ্য কখনও তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে—পরিচিত, অতি পরিচিত সেই রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, নগরোদ্যান ক্রীড়াক্ষেত্র। হয়তো মনে পড়ে থাকবে সেইক্রীড়া প্রতি-যোগিতার কথা। হয়তো সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে নিজের কানে বেজে উঠেছিল পুরোনো স্মৃতি মন্থন করা, ভুলে যাওয়া দুটি কথা—'যুবরাজ, কি পুরস্কার দেবেন আমায়।' তারপর দ্রুতগতিতে কালচক্রের পরিবর্তন হয়। দ্রুততর গতিতে মানস জগতে নেমে আসে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। যুবরাজ সিদ্ধার্থ রূপান্তর লাভ করেন --- তথাগত বুদ্ধ রূপে। তার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে---তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধ মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছেন ---তিনি আজ পরিবারের নন, শাক্য বংশের নন, কপিলাবস্তুর নন, তিনি আজ পৃথিবীর। সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে তিনি আজ ব্যাপ্তিলাভ করেছেন

সকল মানুষের অন্তরে। আজ কপিলাবস্তু তাঁর কাছে কোনো বিশিষ্ট অনুভূতি বহন করে আনে না। তাঁর দৃষ্টিতে আত্মীয় পর, জানা অজানা, সব একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি চীবর পরিহিত অবস্থায় ভিক্ষাপাত্র হাতে নিষ্কম্প পদে কপিলাবস্তুর রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাজধানীর অগণ্য নরনারী বিস্ময়াহত হয়ে এই অতিপ্রিয় সৌম্যকান্তি শ্রমণের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রাজপথের দুধারে যে সব প্রাসাদ ছিল তাদের বাতায়ন থেকে বহু কৌতুহলী দৃষ্টি রাজপথে ভ্রমণরত শ্রমণের প্রতি আকৃষ্ট হলো। সংবাদটী রাজধানীর সর্বত্র প্রচারিত হলো। ক্রমে শুদ্ধোদনও এই ভিক্ষাবৃত্তির কথা শুনতে পেলেন। তিনি ত্রস্তপদে ছুটে এলেন। তার বংশের ছেলে রাজপথে ভিক্ষার্থী হয়ে পরিভ্রমণ করবে এটা তাঁর সম্মানের পক্ষে হানিকর এবং রাজবংশের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। তিনি বুদ্ধকে ভিক্ষা গ্রহণ নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ শুদ্ধোদনের কথার যুক্তি গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি বল্লেন: রাজবংশের পক্ষে ভিক্ষা বৃত্তি মর্যাদা হানিকর হতে পারে, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী তার পক্ষে ভিক্ষা গ্রহণ স্বাভাবিক এবং রীতি সম্মত। তিনি আরো বল্লেন: রাজবংশ আর বুদ্ধবংশ এক নয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শুদ্ধোদনের অনুরোধে তিনি যে ক'দিন কপিলাবস্তুতে অবস্থান করবেন সেই ক'দিন রাজপথে ভিক্ষা সংগ্রহ না করে শুদ্ধোদনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

যেদিন প্রথম তিনি রাজপ্রাসাদে আহার্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন শাক্যরাজ পরিবারের পুরনারীরা সকলেই অন্তহীন কৌতুহল নিয়ে তাঁকে দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রজাবতী গৌতমী এবং অন্যান্য দু'চারজন পুরনারী বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যখন তাঁকে আহার্য পরিবেশন করছিলেন তখন তাঁরা শুধু আহার্য পরিবেশনই করেন নি তাঁরা তাঁদের অন্তরের স্নেহ তাঁকে ঢেলে দিয়েছিলেন। পুরনারীরা একে একে সকলেই বুদ্ধকে দর্শন করলেন কিন্তু রাহুলমাতা তাঁর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন না। দু'চারজন আত্মীয়া যখন উপযাচিকা হয়ে বুদ্ধদর্শনে যেতে অনুরোধ করলেন তখন রাহুলমাতা তাঁদের বল্লেন, 'বুদ্ধের যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।' একান্ত সঙ্গোপনে আশা আশঙ্কায় দোলায়িত হয়ে

রাহুলমাতা তাঁর অন্তরে যে ইচ্ছাটী প্রকাশ করছিলেন তা অন্তর্যামী বুদ্ধ হয় তো জানতে পেরেছিলেন। তাই আহারান্তে বুদ্ধ সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে করে অন্তঃপুরে গোপার কক্ষে উপস্থিত হলেন। গোপা বুদ্ধ ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করেন নি, তাই এই চিরবাঞ্ছিত পুরুষটীকে দেখামাত্র তাঁর অন্তরের সমস্ত কামনা একটি প্রণামের ভঙ্গীতে তিনি নিবেদন করলেন বুদ্ধের চরণে—কিন্তু পরক্ষণেই বুদ্ধের শিষ্যদের দেখে তিনি সংযত হয়ে কক্ষের এক-প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরেই শুদ্ধোদন সে কক্ষে প্রবেশ করলেন। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করার পরে রাজবধূ গোপার জীবন কি অসাধারণ কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে শুদ্ধোদন পুত্রের কাছে তাঁর কাহিনী বিবৃত করলেন। বুদ্ধ সব কথা শুনে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন—'রাহুলমাতা তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন।' নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে এই সামান্য কথা বলেই বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কপিলাবস্তুতে প্রতিদিন বুদ্ধ অগণিত নরনারীর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। ক্রমে বহুলোক তাঁর শরণাগত হয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। শাক্যবংশীয়দের মধ্যেও অনেকে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। প্রথমে পিতৃব্য শুক্লোদন এবং পরে অমৃতোদন এবং দ্রোণোদন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। রাজপরিবারের বহুলোক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরেও শুদ্ধোদন দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যে তাঁর মনে ভাবান্তর এলো। একদিন বুদ্ধ যখন ন্যগ্রোধ আরামে সমবেত দর্শনার্থীদের সম্মুখে তাঁর ধর্মমত ব্যাখা করছিলেন তখন সেই সভা-গৃহের একান্তে সকলের অলক্ষ্যে বসেছিলেন শুদ্ধোদন। তন্ময় হয়ে ধর্মব্যাখা শুনতে শুনতে সহসা তাঁর মনে হলো যেন তাঁর পুত্রের দেহ থেকে স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর তাঁর চারদিক ঘিরে রয়েছেন স্বর্গের দেবতারা। এই দৃশ্য দেখে শুদ্ধোদন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বুদ্ধের ভাষণ সমাপ্ত হওয়ামাত্র তিনি দীক্ষার্থী হয়ে বুদ্ধের চরণে প্রণত হলেন। বুদ্ধ তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন।

চৌদ্দ

শুদ্ধোদন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন—এই সংবাদ কপিলাবস্তু রাজ্যে প্রচারিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধার ভাব অনেকখানি বেড়ে গেল। প্রতিদিন বহু সহস্র নরনারী বুদ্ধের দর্শনাকাঙ্খী হয়ে ন্যগ্রোধ আরামে সমবেত হতো। বুদ্ধের মুখে ধর্মালোচনা শুনে তারা দলে দলে তাঁর শরণাগত হয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুললে। শাক্য রাজপরিবারের যুবকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের দীক্ষাগ্রহণ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তিব্বতী গ্রন্থে জানা যায় যে শাক্য রাজকুমারদের আগ্রহাতিশয্য দেখে শেষ পর্য্যন্ত শাক্যনায়করা স্থির করলেন যে প্রতি পরিবার থেকে অন্ততঃ একজনের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। শাক্যরাজকুমারদের মধ্যে এই সময় যারা দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসে যারা অসামান্য কীর্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আনন্দ। ইনি ছিলেন বুদ্ধের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র। তিব্বতী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে শাক্যরাজকুমাররা যখন একে একে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন অমৃতোদন তাঁর পুত্র যাতে অন্যান্য রাজকুমারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে না পারে সেইজন্য তিনি তাঁকে কপিলাবস্তুর বাহিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন গৃহে ফিরে অমৃতোদন সবিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁর পুত্র তাঁরই গৃহে বুদ্ধকে পরম যত্নে আহ্বান করে তন্ময় হয়ে তাঁর উপদেশ শুনছেন। আনন্দ কখন কিভাবে ফিরে এলো অমৃতোদন তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি শুধু দেখতে পেলেন তাঁর পুত্রের মুখে চোখে বুদ্ধের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি পুত্রকে দীক্ষা গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তারপর থেকে বুদ্ধ আর আনন্দের জীবন পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে পড়লো গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আনন্দ আজীবন বুদ্ধের

সেবা, বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের ঐক্য ও শুচিতা রক্ষা কল্পে নিজের শক্তি সামর্থ্য অকাতরে নিয়োজিত করেছিলেন।

আনন্দ ছাড়া এই সময় আরো একজন শাক্য যুবক বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এঁর নাম নন্দ ইনি বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই, মহাপ্রজাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ যে ক'দিন ন্যগ্রোধ আরামে অবস্থান করেছিলেন ততদিন প্রত্যহ নন্দ তুবেলা বুদ্ধ দর্শনে যেতেন এবং সমাগত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে একাসনে বসে বুদ্ধের উপদেশ বাণী শুনতেন। একদিন বুদ্ধ ভিক্ষা পাত্র হাতে কপিলাবস্তুর রাজপথে বেরিয়েছেন, সঙ্গে জন কয়েক ভিক্ষু। রাজ প্রাসাদ থেকে এই দলটীকে দেখতে পেয়ে নন্দ তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণ পথ চলার পর বুদ্ধ তার ভিক্ষা পাত্রটী নন্দর হাতে দিলেন। নন্দ হাত বাড়িয়ে পাত্রটি গ্রহণ করে পথ চলতে লাগলেন। ক্রমে নগরের সব ক'টি রাজপথ পরিভ্রমণ করে বুদ্ধদেব যখন সঙ্গীদের নিয়ে নগরের উপকণ্ঠে তাঁর আবাসস্থানে ফিরে এলেন তখনও নন্দর হাতে সেই ভিক্ষা পাত্র। নন্দ ভিক্ষুদলে যোগ দেবেন কিনা এই নিয়ে সংশয় বোধ করছিলেন—আজ স্বয়ং বুদ্ধের কাছ থেকে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণের আদেশ পাওয়ায় সে সংশয় ঘুচে গেল। তিনি সর্বান্তঃকরণে সঙ্ঘে যোগ দিলেন। রাজপরিবার থেকে আরো একজন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—তিনি বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র দেবদত্ত। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবদত্তের বহু কুকীর্তির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তিনি স্বেচ্ছায় বুদ্ধের শরণাগত হন নি। শাক্য রাজবংশের প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্ততঃ একজনকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করা যখন বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয় তখন দেবদত্ত এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থের সঙ্গে তাঁর বৈরীভাব ছিল। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে যখন সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করেছিলেন তখনও দেবদত্ত তাঁর পূর্বভাব বিস্মৃত হয়ে বুদ্ধের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য দেখাতে পারেন নি। পরবর্তী-কালে দেবদত্তকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘজীবনে অনৈক্য ও তুর্নীতি প্রবেশ করছিল।

কপিলাবস্তুর জনসাধারণের মধ্যে যখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল তখন শুদ্ধোদন একদিন রাজপরিবারের কয়েক

জন যুবককে বৌদ্ধ ধর্মে গ্রহণে অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রচলিত বিধান অনুসারে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার্থীকে মস্তক মুণ্ডন করে চীর বাস পরিহিত হয়ে বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হতে হতো। একসঙ্গে বহু যুবক যাতে দীক্ষিত হতে পারে সেইজন্য শুদ্ধোদন রাজকুমারদের সঙ্গে উপালী নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচর কে পাঠালেন। উপালী ছিলেন জাতিতে নাপিত। যুবকরা ন্যগ্রোধ আরামের সমীপবর্তী হয়ে উপালীর কাছে প্রথমতঃ মস্তক মুণ্ডিত করে নিয়ে তারপর তাদের পরিহিত বসন ভূষণ উপালীর কাছে রেখে দিয়ে দীক্ষা গ্রহণের জন্য বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। যুবকরা চলে যাবার পরক্ষণে উপালীর মনে হলো যে যাঁর আকর্ষণে রাজপুত্ররা রাজোচিত ঐশ্বর্য্য ভোগের নিশ্চিত সম্ভাবনা ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে ক্ষণিকের জন্যও দ্বিধা বোধ করে না, সেই আকর্ষণের প্রতি তিনি যদি নিঃস্পৃহ থাকেন তাহলে জীবনে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। এই মনে করে উপালী নিজের হাতে মস্তক মুণ্ডন করে চীরবাস পরে ন্যগ্রোধ আরামে উপস্থিত হলেন। রাজপুত্ররা যেখানে দীক্ষার জন্য সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, উপালী অনেকখানি সংকোচ নিয়ে সেই কক্ষের এক-প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজপুত্রদের দীক্ষিত করে বুদ্ধদেব তাঁকেও দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি দেবেন, তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠবে মৈত্রী ও প্রেমের নতুন স্বর্গের স্বপ্ন—অধীর আগ্রহ নিয়ে উপালী অপেক্ষা করে রইলেন। একটু পরেই সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন করুণার প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধ। সমবেত দীক্ষার্থীদের দিকে একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে বুদ্ধ উপালীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তারপর অঙ্গুলী নির্দেশে তিনি তাঁকে এগিয়ে আসতে বল্লেন। উপালী অগ্রসর হলে বুদ্ধ তাঁকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তারপর তিনি শাক্যযুবকদের একে একে তাদের প্রত্যেককে দীক্ষিত করলেন। দীক্ষাগ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হলে বুদ্ধ শাক্য-যুবকদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভিক্ষু উপালীকে নতশির হয়ে অভিবাদন জানাতে বললেন। নবদীক্ষিত যুবকেরা সকলেই বুদ্ধের নির্দেশ পালন করলেন—শুধু একজন ছাড়া—তিনি হলেন দেবদত্ত। রাজকুলে জন্ম বলে তাঁর অহমিকা-বোধ তাঁকে উপালীর কাছে নতশির হবার পথে বাধা হয়ে দেখা দিল।

ধর্মচক্র প্রবর্তন

বুদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ উপালীর কাছে শাক্য যুবকদের প্রণত হবার নির্দেশ দিয়ে শুধু এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন যে বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। কুল বা বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য এই ধর্ম স্বীকার করে না। এ ধর্মের অবদান সার্বজনীন ও সর্বত্রগামী। দেবদত্ত সেদিন প্রকাশ্যে বুদ্ধের আদেশ অমান্য করে যে বিদ্রোহপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছিলেন পরবর্তীকালেও তার সে মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি।

কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ যে ক'দিন অবস্থান করেছিলেন সে ক'দিন প্রত্যহ তাঁর কাছে দর্শনার্থীর অসম্ভব ভীড় হতো। এদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রাজপরিবারের বহু যুবক তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বালক রাহুল। ইতিপূর্বে রাহুল কোনদিন পিতাকে প্রত্যক্ষ করে নি। পিতার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাও সে শোনে নি। বুদ্ধ যখন কপিলাবস্তু দর্শনে এলেন তখন সেখানকার নরনারী সকলেই যখন পরম শ্রদ্ধায় আর গভীর পরম বিস্ময়ে দেখছিলেন তখন রাহুলও জনতার মাঝে মিশে গিয়ে এই সম্মানীয় শ্রমণকে দেখে থাকবে কিন্তু তাঁর অন্তরে খানিকটা কুতূহল ছাড়া আর কোনো ভাব স্থান পায় নি। বুদ্ধ যখন আহার্য গ্রহণের জন্য প্রত্যহ রাজপ্রাসাদে আসতেন তখনও রাহুল তাঁকে দেখে থাকবে। একদিন যখন বুদ্ধ আহার গ্রহণের জন্য রাজপথ দিয়ে প্রাসাদের দিকে আসছিলেন তখন রাহুলমাতা তাকে জানালার কাছে ডেকে নিয়ে বুদ্ধকে দেখিয়ে বললেন 'ঐ শ্রমণ তোমার পিতা, ওঁর কাছে থেকে তোমার পিতৃধন চেয়ে নাও।' বুদ্ধ আহারান্তে যখন ন্যগ্রোধ আরামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন রাহুল তাঁর কাছে পিতৃধন চাইলো। বুদ্ধ কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কি ভেবে তিনি তাকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। বালক রাহুল বুদ্ধকে অনুসরণ করে ক্রমে ন্যগ্রোধ আরামে উপস্থিত হলো। বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন : 'রাহুল তার পিতৃধন চাইছে তাই আমার যা শ্রেষ্ঠধন তাই তাকে দেবো।' তারপর তাঁর কথামত সেই-খানে চীর বাস ও ভিক্ষা পাত্র আনা হলো। মুণ্ডিত মস্তক রাহুল

বুদ্ধ সমসাময়িক ভারতবর্ষ
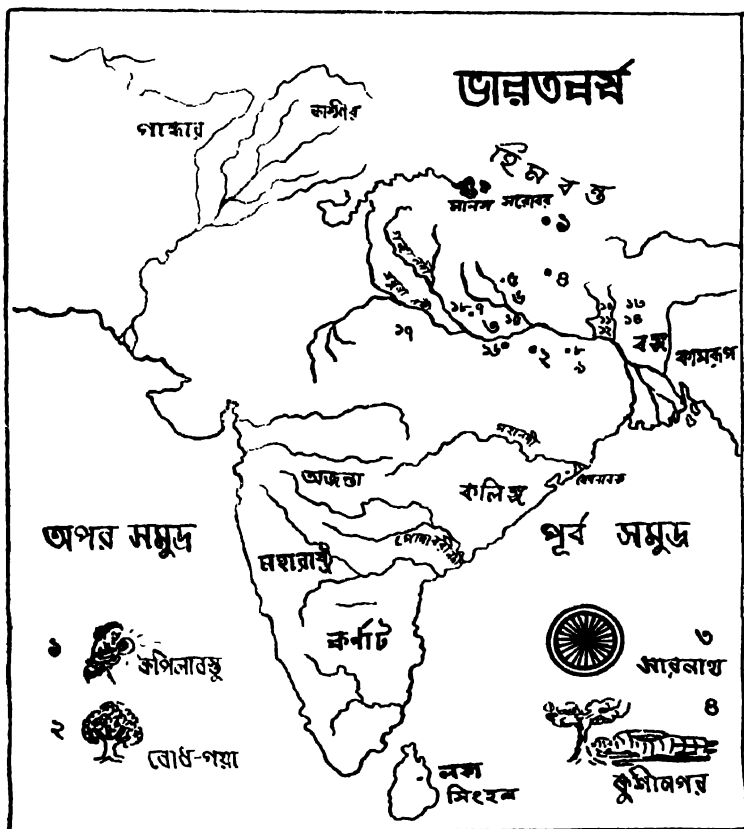
১। কপিলাবস্তু (তিলাওরাকোট) ২। বোধগয়া, ৩। সারনাথ, ৪। কুশীনগর, কাসিয়া, (গোরখপুর) ৫। শ্রাবস্তী (সহেঠ-মহেঠ), ৬। কোশল, ৭। সাকেত, (অযোধ্যা), ৮। নালন্দা, ৯। রাজগৃহ (রাজগীর), ১০। মথিলা, ১১। বিদেহ, ১২। পাটলিপুত্র (বড়গাঁও, পাটনা), ১৩। অঙ্গ, ১৪। চম্পা, (ভাগলপুর), ১৫। বৈশালী (বেসাড়, মজঃফরপুর), ১৬। কাশী, ১৭। বৎস, ১৮। কৌশাম্বী (কোসাম, এলাহাবাদ)।

[বন্ধনীর ভিতরে লিখিত নামগুলি আধুনিক যুগের নাম]

স্নানান্তে চীবর বাস পরিহিত হয়ে, ভিক্ষা পাত্র হাতে দীক্ষা গ্রহণ করলো।

রাহুলের দীক্ষা গ্রহণের সংবাদ পেয়ে শুদ্ধোদন ছুটে এলেন বুদ্ধের কাছে। নন্দর দীক্ষাগ্রহণের পর রাহুলই ছিল শুদ্ধোদনের একমাত্র আশা। তার হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে তিনি অবসর নেবেন এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু সেই আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। বুদ্ধের কাছে ছুটে গিয়ে তিনি অনেক অনুরোধ করলেন যেন রাহুলকে সংসারে ফিরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধ যাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকার দিয়েছেন—তার পক্ষে আর সংসারে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। শুদ্ধোদনকে তাই হতাশ হয়ে গৃহে ফিরে যেতে হলো তবে তাঁর অনুরোধে বুদ্ধ এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে অতঃপর পিতা মাতার অনুমোদন ছাড়া কাউকে দীক্ষাদান করা হবে না।
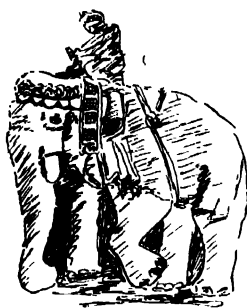
পনের

কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধ শীঘ্রই রাজগৃহে প্রত্যাগমন করবেন এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যগ্রোধ আরাম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। যাঁরা বুদ্ধকে কোনো দিন দেখেন নি তাঁরা দলে দলে বুদ্ধ দর্শনে এলেন। যাঁরা বহুবার তাকে দেখেছেন তারাও শেষবারের মত তার দর্শনলাভে ছুটে এলেন। সমস্ত কপিলাবস্তু যেন ভেঙ্গে পড়লো ন্যগ্রোধ আরামে। সেখানে তিল ধারণের স্থান নেই, সকলেই বুদ্ধকে দর্শন করতে চায়—তাঁর উপদেশ শুনতে চায়। বুদ্ধের কোনো ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, সমস্ত দিন ধরে তিনি অগণিত ভক্তকে দর্শন দান আর উপদেশ বিতরণ করে চলেছেন। কপিলাবস্তুর রাজপরিবারের অন্তঃপুরিকারাও আজ শুদ্ধোদনের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন বুদ্ধ দর্শনে যাবেন। সকাল থেকেই অসম্ভব কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তাদের যাত্রার আয়োজন চলছিল। তারপর যখন প্রস্তুতির শেষে তাঁরা দল বেধে সবাই যাত্রা করলেন তখন তাদের চোখে মুখে অপরিসীম উৎসাহ আর উদ্দীপনা ফুটে বেরুচ্ছে। ন্যগ্রোধ আরামের দূরত্ব নেহাৎ সামান্য নয়। তারা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করেছেন এমন সময় শাক্য নায়ক মহানামনের স্ত্রীর সঙ্গে জনৈক ভিক্ষুর সাক্ষাৎ হলো। মহানামনের স্ত্রী যুবতী ছিলেন এবং তিনি বেশভূষা এবং অলঙ্কার ভূষিতা হয়ে বুদ্ধ দর্শনে যাচ্ছিলেন তখন তার সঙ্গে এই ভিক্ষুর সাক্ষাৎ হলো। ভিক্ষু যুবতীটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, "আমায় মার্জনা করুন ; আপনাকে দেখে আমি এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সর্বত্যাগী মহাসন্ন্যাসীকে দর্শনের জন্য আপনি যাচ্ছেন তাতে আপনার পরিচ্ছেদ এবং অলঙ্কার বাহুল্য না থাকলে শোভন হতো।" ভিক্ষুর কথায় যুবতী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। পরক্ষণে তিনি তার পরিচারিকার হাতে তার সমস্ত অলঙ্কারের বোঝা তুলে দিয়ে তাকে অবিলম্বে রাজ অন্তঃপুরে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। পরি-

চারিকা বুদ্ধের দর্শনের জন্য অনেক আশা করে ন্যগ্রোধ আরামের দিকে সকলের সঙ্গে যাত্রা করেছিল কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মহানামন-পত্নীর আদেশ পেয়ে তাঁর সকল বোঝা নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললো। অলঙ্কার গুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে দিয়ে যত শীগগীর ফিরে আসতে পারে এই তার একমাত্র লক্ষ্য। রাজপ্রাসাদে পৌছে পরিচারিকা একটি মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে না। অলঙ্কারগুলো রেখেই আবার সে ছুটতে আরম্ভ করলো। পথ আর ফুরোয় না। কি জানি তার যদি দেরী হয়ে যায়, যদি ইতিমধ্যে পরম বাঞ্ছিত পুরুষটী কপিলাবস্তু ত্যাগ করে যান। কিন্তু কই সে আর চলতে পাচ্ছে না, তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তবু তাকে চলতেই হবে। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে সে পা বাড়ালো কিন্তু এইটাই তার শেষ পদক্ষেপ। পরমূহুর্তে তার বিগতপ্রাণ দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। অখ্যাত নাম্নী এই পরিচারিকার কাছ থেকে বুদ্ধ পেলেন শ্রেষ্ঠদান—জীবন-দান।

তিব্বতী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে বুদ্ধ যেদিন কাপলাবস্তু ত্যাগ করে যান সেদিন শাক্যবংশীয়া বহু সম্ভ্রান্ত নারীকে পুরোভাগে নিয়ে স্বয়ং মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলে কিন্তু বুদ্ধ সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি। মহা-প্রজাবতী সেদিন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে রাজপ্রাসাদের কারাগৃহে ফিরে গেলেন। সঙ্ঘের বৃহত্তর মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার সৌভাগ্য তাঁর হলো না।

কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধ আবার রাজগৃহের পথে ফিরে চললেন এবার তাঁর দ্বিতীয় যাত্রা। প্রথম যাত্রা কালে রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে তিনি যে পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন, আজ শত শত শিষ্য পরিবৃত হয়ে দিনের আলোতে সেইপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর যাত্রাপথে প্রথমে দেখতে পেলেন সেই অনুপ্রিয় গ্রাম। এইখানকার আম্রবনে তিনি প্রথমবারের মত এবারেও কিছুদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর আবার তাঁর যাত্রা সুরু হলো। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অবশেষে তিান রাজগৃহের পথে বৃজি দেশে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ যখন তার শিষ্যদের সহ বৃজি দেশে অবস্থান করছিলেন তখন কপিলাবস্তু থেকে মহাপ্রজাবতী বহু শাক্যনারী পরিবৃত

হয়ে তাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। শুধু দর্শন করেই তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেন নি—সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু এবারেও প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের ফিরে যেতে হোলো।

বৃজিদেশে কিছুদিন অবস্থান করার পর বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে বৈশালীতে উপস্থিত হলেন। তখনকার যুগে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে বৈশালী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে এখানে বহু বিদ্বজন এবং ধর্মাচার্য মিলিত হতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রন্থ বা জৈন ধর্মাবলম্বীগণ প্রকাশ্যে বুদ্ধের বিরোধিতা করে আসছিলেন। বৈশালীতেই বহু জৈন ধর্মাচার্য বাস করতেন। হয়তো তাঁদর সঙ্গে ধর্মালোচনা করে নিজের ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বৈশালীতে এসেছিলেন। তাছাড়া বৈশালী ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর খুব ভালো লাগতো; তাই সময় ও সুযোগ পেলে তিনি বৈশালীতে আসতেন। বৈশালীতে অবস্থান করার সময় একদিন বুদ্ধ শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করছেন এমন সময় আনন্দের কাছে খবর এলো যে পাঁচশত শাক্য পুরনারী বুদ্ধের সাক্ষাৎপ্রার্থী। কপিলাবস্তু থেকে বৈশালী অনেক দূর, তাছাড়া শাক্যপুরনারীরা পদব্রজে ভ্রমণে অভ্যস্তা নন তবু দীর্ঘপথ পরিক্রমার কষ্ট স্বীকার করে মহাপ্রজাবতীর নেতৃত্বে তাঁরা বুদ্ধের কাছে এসেছেন সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের প্রত্যাশায়। ইতিপূর্বে দু'বার তাঁরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন কিন্তু সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। বুদ্ধের উপদেশ তাঁরা তাঁর মুখ থেকে একাধিকবার শুনেছেন। তাঁর উপদেশ তাঁরা সমগ্র অন্তর দিয়ে পালন করে এসেছেন কিন্তু তাতে তাঁরা পরিতৃপ্ত হতে পাচ্ছিলেন না, তাঁদের মনে হচ্ছিল সংসারের সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে যতক্ষণ না তাঁরা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করবেন ততদিন তাঁদের চিত্তের স্থৈর্য ফিরে আসবে না—তাই প্রত্যাখ্যাত হয়েও তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন। সংবাদ পেয়ে আনন্দ মাতা গৌতমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। গৌতমী এবং অন্যান্য পুরনারীরা সকলেই চীরবাস পরিহিতা, পথশ্রমে তাঁরা সকলেই ক্লান্ত, তবু তাঁদের চোখে মুখে আশার সুস্পষ্ট চিহ্ন। গৌতমীর অনুরোধ

জানাতে স্বীকৃত হয়ে আনন্দ বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালেন, কিন্তু বুদ্ধ এবারেও তাঁদের সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। আনন্দ ব্যথিত অন্তরে ফিরে এসে মাতা গৌতমীকে প্রত্যাখ্যানের সংবাদ জানাবামাত্র তাঁর এবং তাঁর সহযাত্রীদের চোখে মুখে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো হতাশার চিহ্ন। আনন্দ এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে আবার বুদ্ধের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন—শাক্য নারীদের আন্তরিক আকাঙ্খার কথা আনন্দ নিবেদন করলেন বুদ্ধের কাছে। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন, এবার যেন তাঁদের প্রার্থনা বিফল না হয়। বুদ্ধ তখন আনন্দকে বললেন: "যদি মাতা প্রজাবতী এবং তাঁর সঙ্গিনীরা আটটি সর্ত মানতে সম্মত হন তাহ'লে তিনি তাঁদের সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি দেবেন।" সর্তগুলো জেনে নিয়ে আনন্দ তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন মাতা গৌতমীর কাছে। তাঁরা তখনি সর্ত মানার প্রতিশ্রুতি দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সঙ্ঘে যোগদান করার বহু আকাঙ্খিত সুযোগ পেলেন।

ষোল
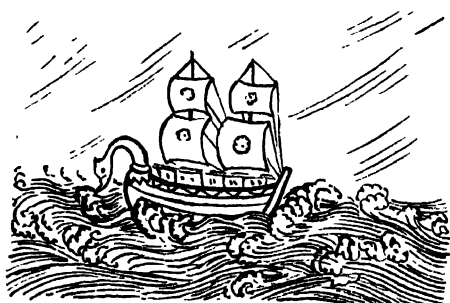
বৈশালীতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু নরনারী বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু বৈশালীর অধিবাসীদের মধ্যে বুদ্ধর শিষ্যরূপে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন যিনি তাঁর নাম আম্রপালী। সম্ভ্রান্তবংশে এঁর জন্ম হয় নি—ইনি ছিলেন গণিকা। কিন্তু সেই যুগে গণিকাদের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ সুকুমার বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। গণিকাশ্রেষ্ঠা আম্রপালী মগধরাজ বিম্বিসারের অনুগ্রহ-পুষ্ট ছিলেন। ইনি বৈশালী নগরে বসবাস করতেন। বুদ্ধ বৈশালী আসবার পর বহু নরনারী তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। বুদ্ধ সকলকেই দর্শন ও উপদেশ দানে ধন্য করলেন। পরদিন আম্রপালী বুদ্ধ দর্শনে এসে বহুক্ষণ ধরে তাঁর উপদেশ শুনলেন। যাবার সময় আম্রপালী করজোড়ে বুদ্ধের কাছে একটি প্রার্থনা পুরণের আদেশ জানালেন। তাঁর প্রার্থনা—পরদিন বুদ্ধ তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবেন। বুদ্ধ নিরুত্তর রইলেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি যদি নিরুত্তর থাকতেন তাহলে বোঝা যেত যে নিমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর সম্মতি আছে। খুসী হয়ে আম্রপালী ফিরে গেলেন। পরদিন যথাসময়ে বুদ্ধ আম্রপালীর গৃহে উপস্থিত হলেন। আহার্য গ্রহণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বুদ্ধ সমবেত দর্শনার্থীদের ধর্মবিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন। তারপর দর্শনার্থীরা একে একে ফিরে গেলেন। আম্রপালী তখন বুদ্ধের পায়ে প্রণত হয়ে তাঁর আর একটি ইচ্ছা পুরণের অনুরোধ করলেন। আজীবন তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন তা সৎকার্য্যে ব্যয় করার ইচ্ছায় তিনি নগরীর উপকণ্ঠে একটি উপবন ক্রয় করেছেন—তাঁর একান্ত ইচ্ছা এইখানে একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেটি বুদ্ধকে দান করবেন। বুদ্ধ তাঁর এই ইচ্ছা পুরণ করলেন। অনতিকাল মধ্যে বৈশালীর উপকণ্ঠে বিরাট আয়তন

সুদৃশ্য একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হলো। আম্রপালীর সৌভাগ্য দেখে বৈশালীর বহু নরনারী ঈর্ষা বোধ করতেন। কিন্তু বুদ্ধের আশীর্বাদপুষ্ট এই রমণীর অন্তরে ঈর্ষা বা অসূয়ার কোনো স্থান ছিল না।

বৈশালী এবং বৈশালীর অধিবাসী লিচ্ছবিদের সম্পর্কে বুদ্ধ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হলেও বুদ্ধ প্রাকৃতিক শোভা সম্পদের প্রতি কোনদিনই উদাসীন ছিলেন না। ফুলের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ ছিল। বন্ধু কালুদায়ী এ কথা জানতেন তাই তাঁকে কপিলাবস্তু নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ করে তিনি তাঁর কাছে রাজগৃহ থেকে কপিলাবস্তু যাবার পথে পথের দু'ধারে নানাবর্ণের যে সব ফুল ফুটে থাকতো তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ যখন বুদ্ধের উদ্দেশ্যে জেতবন বিহার উৎসর্গ করেন তখন তিনি সুগন্ধি কাষ্ঠ দিয়ে বুদ্ধের বাস কক্ষটি নির্মাণ করেছিলেন। অনাথপিণ্ডদ জানতেন সুগন্ধি বুদ্ধের কত প্রিয়। বৈশালীর প্রাকৃতিক শোভা বুদ্ধের খুব ভালো লাগতো, তাই সময় ও সুযোগ পেলে তিনি মাঝে মাঝে এই নগরীর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। শেষবার যখন বৈশালী ত্যাগ করে যান তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল অন্তরে তিনি ক্লেশ অনুভব করছিলেন।

বৈশালীতে কিছুদিন অবস্থান করার পর বুদ্ধ রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজগৃহ ছিল তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রধান কর্মক্ষেত্র। দেশ দেশান্তর থেকে বহু বৃত্তিধারী লোক এইস্থানে সমবেত হতেন—এখানে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহু বিদ্বজ্জন বাস করতেন। আর এই রাজগৃহকে কেন্দ্র করেই আর্যাবর্ত জুড়ে একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা দেখা দিয়েছিল। মগধরাজ বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের পরম অনুরক্ত এবং তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজ্যের রাজারাও বুদ্ধের সংস্পর্শলাভ করে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। সমসাময়িক সাহিত্যে কোশল রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। শাক্যরাজ্য কপিলাবস্তু এককালে কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—পরে শাক্যরা স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসীরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। মগধরাজ

বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎএর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং বিম্বিসারের আমন্ত্রণ ক্রমেই প্রসেনজিৎ রাজগৃহে এসে বুদ্ধের সাক্ষাৎলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। কোশলরাজ মহিষী বর্ষিকা ও মল্লিকা উভয়েই বুদ্ধের প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত ছিলেন—এইভাবে কোশলরাজপরিবারের সঙ্গে বুদ্ধের একটি মধুর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। প্রসেনজিৎ বুদ্ধের কাছে শুধু ধর্মালোচনার জন্য আসতেন তা নয়—অনেক সময় দুরূহ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি বুদ্ধের শরণাপন্ন হতেন।

বিম্বিসার এবং প্রসেনজিৎ যখন যথাক্রমে মগধ ও কোশলরাজ্যে রাজত্ব করতেন তখন বৎসদেশের রাজা ছিলেন উদয়ন। সমসাময়িক সাহিত্যে এঁকেও পরাক্রমশালী নরপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উদয়নের রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধ প্রচারক দল প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তাতে বিশেষ ফললাভ হয় নি। এমন কি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মৌদ্‌গল্যায়নের প্রচারকার্যও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি। পরে বুদ্ধ নিজে ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে কৌশাম্বীতে আগমন করেন। উদয়ন প্রথমে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না বরং আজীবিক এবং জৈন প্রচারকদের মুখে বুদ্ধ সম্বন্ধে নানা বিকৃত ও অর্দ্ধসত্য বহু কাহিনী শুনে বুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু যখন বুদ্ধ উপযাচক হয়ে কৌশাম্বীতে উপস্থিত হয়ে রাজার দর্শনপ্রার্থী হলেন তখন উদয়ন তাঁর দিব্যকান্তি দর্শন আর মুখ নিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছিলেন—এ রকম সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাব থাকলেও তিনি তাঁর রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথে সকল বাধা অপসারিত করেছিলেন—এরূপ ইঙ্গিতের অভাব প্রাচীন সাহিত্যে নেই।

আর্যাবর্তের আরো একটি রাজ্যের অধিপতির সঙ্গে বুদ্ধের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি গান্ধার দেশের রাজা পুক্কসতি। বুদ্ধকে দর্শন করার পূর্বেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মকে জীবনের সার বলে গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত পরিবেশের মধ্যে ইনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তখন রাজগৃহে অবস্থান করেন। প্রতিদিন তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে রাজধানীর পথে বার হন। ভিক্ষান্ন

নিয়ে ফিরে এসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার পর শিষ্যদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনায় এবং ধ্যাননিবিষ্ট অবস্থায় তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। কখনও রাজধানী ছেড়ে তিনি দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে পর্যটন করতেন। একবার রাজগৃহের অদূরে পর্যটন কালে রাত্রি সমাগত দেখে তিনি এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এই গৃহে অবস্থান কালে তিনি ভূতপূর্ব গান্ধার রাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কারণ গান্ধার রাজও সেইদিন দৈবক্রমে সেইগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। উভয়ে উভয়ের পরিচয় লাভে পরমপ্রীত হলেন। বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিদের সক্রিয় সহযোগিতা ধর্মপ্রচারে বুদ্ধকে প্রভূত সহায়তা করেছিল একথা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন রাজ্যের রাজারাই শুধু বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, সাধারণ শ্রেণীর নরনারীর মনেও বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বুদ্ধ সকলের কাছে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন—সহজ সরল ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য সকলের কাছে বুঝিয়ে বলতেন। তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে যা সত্য বলে জেনেছেন তা যখন ভাষায় প্রকাশ করতেন তখন স্বাভাবিক ভাবে তা শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করতো। ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বুদ্ধকে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে বহুযুগের পুঞ্জীভূত সংস্কার অপরদিকে নির্গ্রন্থ, আজীবিক প্রমুখ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ—এ দু'য়ের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের অত্যুৎসাহী নেতারা অনেক সময় বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে অপপ্রচার করতেন। কিন্তু বুদ্ধ এইসব বাধা বিপত্তি আত্মপ্রত্যয়গুণে সহজেই অতিক্রম করেছিলেন। তিনি যে বাণী প্রচার করতেন, নিজের জীবনে সেই বাণীকে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। প্রতিদিন বুদ্ধ অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় হতো প্রতিদিন। তিনি পরম ধৈর্য্যভরে যার যা জিজ্ঞাস্য থাকতো তার যথাযথ উত্তর দিতেন। প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্যাদির পর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তিনি নগরে বার হতেন। দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন।

ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে চলতেন যদি কেউ স্বেচ্ছায় ভিক্ষাপাত্রে কিছুদান করতেন তাহ'লে তিনি গ্রহণ করে তাঁর আবাস স্থানে ফিরে আসতেন। তারপর সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিয়ে আহার্য প্রস্তুত হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী তিনি কোনদিন গ্রহণ করতেন না। প্রতিদিন তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নির্জন কক্ষে অথবা গুহায় ধ্যান নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন—তারপর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন—সন্ধ্যা পর্যন্ত এ আলোচনা চলতো। তারপর দর্শনার্থীরা স্থান ত্যাগ করলে যে সব ভিক্ষুরা বুদ্ধের সঙ্গে থাকতেন তাঁদের তিনি ডেকে পাঠাতেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাঁরা যে সব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতেন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁদের নানারকম প্রশ্ন করতেন এবং কি উপায়ে সেইসব বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। অনেক সময় রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত আলোচনা চলতো। তারপর বুদ্ধ রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই শয্যায় বিশ্রাম না নিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি ধ্যান নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বে আবার আরম্ভ হতো পরদিনের কার্যক্রম। এই ভাবে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চলেছিল বুদ্ধের প্রাত্যহিক জীবনেব ইতিহাস।

বুদ্ধের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শিষ্য মণ্ডলীও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নিঃশেষে নিজেদের সময় ও সামর্থ্য নিয়োজিত করতেন। তাঁদেব আদর্শ নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু নরনারী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধ জাতি ভেদ মানতেন না। সমাজে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ স্বীকার করতেন না। তাঁর আবেদন ছিল সর্বদেশের সর্বলোকের মনে—ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারী নির্বিশেষে সকলেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। রাজা রাজড়ারা যেমন তাঁর পাদনখকণা মাথায় নিয়ে ধন্য হতেন তেমনি সমাজে যারা অস্পৃশ্য অশুচি বলে পরিগণিত হতো তারাও তাঁর শরণাগত হয়ে কৃতার্থ বোধ করতো। উপালীকে দীক্ষিত করে পরে শাক্য রাজকুমারদের দীক্ষাদান করে বুদ্ধ তাঁদের উপালীর কাছে প্রণত হয়ে আশীর্বাণী ভিক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে একথাই প্রমানিত করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর ধর্মসঙ্ঘ সাম্য ও ন্যায় নীতির উপর

প্রতিষ্ঠিত। সকল শ্রেণীর নরনারীর জন্য তাঁর সঙ্ঘ ছিল অবারিত। রাজ্যের দীনতম প্রজা থেকে আরম্ভ করে ধনী শ্রেষ্ঠী এমন কি রাজা রাজড়ারা পর্যন্ত সকলের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করতেন। নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রতি তিনি সমান কৃপা বিতরণ করতেন। রাজগৃহের মালী সুমন, দীন দরিদ্র সুনীত, নাপিত উপালি এঁরা সকলেই বুদ্ধের কৃপালাভ করেছিলেন যা সম্ভ্রান্ত বংশের অনেকের ভাগ্যে ঘটেনি। সমাজে যারা অস্পৃশ্য ও নীচ বলে গণ্য হতো তারা তাঁর কাছে পেয়েছিল অপরিসীম সম্মান আর মর্যাদা। গণিকা আম্রপালী তাঁর কাছে যে সম্মান পেয়েছিলেন তা সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীদের কাছেও ঈর্ষার বিষয় হতে পারতো। সঙ্ঘজীবন তিনি যে নীতিতে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তাতে কোন বৈষম্যের স্থান ছিল না—সকলেরই সমান অধিকার তাতে স্বীকৃত হয়েছিল। সমসাময়িক যুগে এবং পরবর্তী যুগেও অন্য কোনো সম্প্রদায়ের জীবনে গণ-তন্ত্রের নীতিকে অতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয় নি।
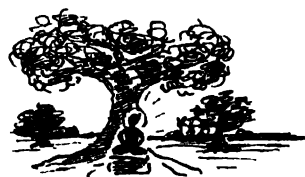
সতের

সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর থেকে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘকাল ধরে নিরলস অধ্যবসায় আর প্রচণ্ড কর্ম প্রচেষ্টা বলে বুদ্ধ আর্যাবর্তের সর্বত্র সাধারণের মধ্যে তাঁর বাণী বিতরণ করেছিলেন। যাঁরা তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী একবার শুনতে পেতো তারা বিনা দ্বিধায় তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করতো। তাছাড়া বুদ্ধ যে সব শিষ্য রত্ন পেয়েছিলেন তাঁদের অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টাও তাঁর ধর্মের প্রসারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন। বিভিন্ন শাস্ত্রে এঁদের যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল—তেমনি অসামান্য ছিল এঁদের চরিত্রবল আর স্বধর্ম-নিষ্ঠা। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য এঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

বুদ্ধের নির্দেশে এঁরা আর্যাবর্তের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু পাণ্ডিত্যের চমক দেখিয়েই এঁরা জনসাধারণের মনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুকুল মনোভাব সৃষ্টি করেছিলেন তাই নয়; এঁদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমতের প্রতি যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা প্রকাশ পেতো জনসাধারণের মনে তার আবেদনও উপেক্ষণীয় ছিল না বুদ্ধ শিষ্যদের অন্যতম ছিলেনআনন্দ। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি ছায়ার মত বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন। বাক্যজাল বিস্তার করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা তিনি করেন নি। অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে দীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কোনো চেষ্টা করেন নি। নির্বাকভাবে অন্তরের সবটুকু মাধুর্য ঢেলে আত্মচিন্তারহিত হয়ে যে ভাবে তিনি নিজেকে বুদ্ধের কাছে উৎসর্গিত করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। সেবাধর্ম দিয়েই তিনি জনচিত্ত অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বহু নরনারী বৌদ্ধ ধর্মের শরণ নিয়েছিলেন। রাজগৃহ, কপিলাবস্তু, সারনাথ, কৌশম্বী, শ্রাবস্তী, বৈশালী এই সব নগরকে কেন্দ্র করে

আর্যাবর্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হলো। বোধিলাভ করার পরেই বুদ্ধের মনে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে যে সঙ্কোচ দেখা দিয়াছিল সে সঙ্কোচ কত অমূলক তা প্রমাণিত করলো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী অগণিত নরনারী।

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের অন্তর যেমন আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল অন্যদিকে তেমনি নিত্য নতুন সমস্যায় সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুদ্ধের মনে অনিশ্চিত অন্ধকারের ছায়াপাত দেখা গেল। বৌদ্ধধর্মদ্বেষীদের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। তাঁরা অবিরাম চেষ্টা করেছিলেন কি করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারেব পথে বাধা সৃষ্টি করা যায়। তা ছাড়া বুদ্ধের অনুগামী দের মধ্যেও দু'চারজন দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সঙ্ঘ-জীবনের কঠোরতাও অনেকের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দানের পক্ষপাতী বুদ্ধ ছিলেন না। আনন্দের আগ্রহাতিশয্যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত সম্মতি দান করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের উপযোগিতা সম্পর্কে বুদ্ধেব নিজের মনে অনেকখানি সন্দেহ ছিল।

প্রথমে লোকান্তরিত হলেন ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ মৌদ্‌গল্যায়ন। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এর জীবনান্ত হয়েছিল। রাজগৃহের অদূরে একটি গুহায় নির্জনবাস করছিলেন মৌদ্‌গল্যায়ন, তখন একদল আততায়ী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করে। পরে আততায়ীরা স্বীকার করেছিল নিগ্রন্থদের প্রভাবে তাঁরা এই জঘন্য দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল। মৌদ্‌গল্যায়নের অভাবে সঙ্ঘের কাজ নিঃসন্দেহে ব্যাহত হয়েছিল। তার কিছুদিন পরে সারিপুত্র দেহ রক্ষা করলেন। কয়েক বছর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল কিন্তু সেদিকে দৃকপাত মাত্র না করে তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়সহ ধর্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োগ করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহের শক্তি ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। দু'এক বছরের মধ্যে তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর শরীর যে যে ভাবে ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ছিল তাতে তাঁর পক্ষে সঙ্ঘের প্রতি কর্তব্য পালনে ত্রুটী ঘটবে। এই চিন্তা তাঁকে অশান্তির অনলে দগ্ধ করতে লাগলো। অবশেষে তিনি বুদ্ধের সম্মতি নিয়ে স্বগ্রাম নালান্দায় বিশ্রাম লাভের জন্য

ফিরে গেলেন। দীর্ঘকাল পরে গ্রামে ফিরে এলেও তিনি তাঁর নিজগৃহে আশ্রয় নিলেন না। মাতা রূপসারি পুত্রের দীক্ষাগ্রহণ ও সঙ্ঘে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। তিনি পুত্রকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। তাই রোগক্লান্ত দেহে সারিপুত্র স্বগ্রামে ফিরে গিয়ে নিজ গৃহের পরিবর্তে রাজপথের পাশে একটি আম্রবৃক্ষ তলে তাঁর আবাস বেছে নিলেন। কিন্তু নালান্দায় এসেও সারিপুত্রের স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না বরং তিনি ক্রমশঃ দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তাঁর ব্যাধির প্রকোপ বেড়ে চললো। সংবাদ পেয়ে মাতা রূপসারি পীড়িত পুত্রকে নিজগৃহে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করেও পুত্রের জীবনরক্ষা করতে পারলেন না। সারিপুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর সহকর্মীরা সকলেই মর্মাহত হলেন। বুদ্ধ শোক দুঃখের অতীত ছিলেন—কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্যের লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ শুনে সারিপুত্রের অভাবে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কতখানি প্রভাবিত করবে সেকথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। মৌদ্গল্যায়ন এবং সারিপুত্রের স্থান গ্রহণ করার যোগ্যতা ভিক্ষুদের মধ্যে আর কারোই ছিল না। বুদ্ধের নিজের দেহ ক্রমশঃ জরা ভারক্রান্ত হয়ে আসছিল। আগের তুলনায় তাঁর কার্যক্ষমতাও কমে আসছিল। তবু নিরলস অধ্যবসায় নিয়ে বুদ্ধ গ্রাম হতে গ্রামে, নগর হতে নগরান্তরে পর্যটন করে উপদেশ বিতরণ করতে লাগলেন। প্রতিদ্বন্দী ধর্মমতের সমর্থকদের সঙ্গে তাঁকে বহু বাদ বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে হয়েছিল, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাঁকে নিজের ধর্মমতকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে হয়েছিল। আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ধর্মের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তাঁরা সকলেই লোকান্তরিত। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাঁরা বিভিন্ন রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধ অথবা তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। তাছাড়া সঙ্ঘজীবনেও মতানৈক্য ও দুর্নীতি ক্রমশঃ যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল তাতেও বুদ্ধ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু এসব সমস্যা সত্ত্বেও ধর্ম প্রচার বিষয়ে বুদ্ধের উৎসাহের কোনো তারতম্য হয় নি। বরং অবস্থার প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্ম প্রচারের উৎসাহ বেড়ে চললো। স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র

মহাপরিনির্বাণ

লক্ষ্য না রেখে তিনি একাগ্রচিত্তে ধর্মপ্রচারে রত হলেন। বর্ষা-ঋতু ছাড়া বৎসরের সমস্ত সময়ে তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার করতেন। যখন যেখানে থাকতেন সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী তাঁর দর্শনলাভের জন্য আসতেন। তিনি তাঁদের শুধু দর্শনই দিতেন না, তাঁদের কানে ঢেলে দিতেন অমৃতোপম বাণী। তারা দীক্ষা গ্রহণ করে আর্যাবর্তের নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করলেন। কপিলাবস্তু থেকে গয়া পর্যন্ত চলেছিল বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের অভিযান।

রাজগৃহ থেকে বুদ্ধ কোটিগ্রামে কিছুদিন অবস্থান করলেন। তারপর কোটিগ্রাম থেকে তিনি গেলেন নাদিকদের গ্রামে। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি ফিরে এলেন বৈশালীতে। এখানে আম্রপালী তাঁকে যে আম্রকানন দান করেছিলেন সেইস্থানে বুদ্ধ কিছুদিন নির্জন বাস করলেন। তারপর ভিক্ষুদের বৈশালীতে রেখে তিনি অনতিদূরে অবস্থিত বেলুব গ্রামে গিয়ে বর্ষা যাপন করলেন। এইস্থানে অবস্থান কালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু বুদ্ধ ভাবলেন যে যদি তাঁর তখনি স্বাস্থ্যহানি অথবা প্রাণহানি ঘটে তাহলে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই তিনি তাঁর স্বাস্থ্যহানির কথা কারুর কাছে প্রকাশ করলেন না স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন এবং অনতিকাল মধ্যে তিনি পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পেলেন।

বুদ্ধ শুধু ধর্মপ্রচারেই তাঁর সকল শক্তি ও সামর্থ অকাতরে নিয়োগ করে-ছিলেন তা নয়। দেশের সাধারণ সমস্যার প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁর মধ্যস্থতায় বহু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। একবার রোহিণী নদীর জলসম্পদ নিয়ে শাক্য এবং কোলিয়দের মধ্যে সংঘর্ষের উপক্রম হলে বুদ্ধের মধ্যস্থতায় শান্তিপূর্ণ ভাবে সে সংঘর্ষের মীমাংসা হয়েছিল। মগধরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে বৃজিদের বিরোধের মীমাংসায় তিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রু তাঁর প্রতি পূর্ব বৈরিতা বিস্মৃত হয়ে অনুরক্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি জন-সাধারণের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার যে বাণী প্রচার করেছিলেন তার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ শান্ত ও মার্জিততর জীবন যাপনে

অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দেশের শাসক শ্রেণী এই কারণে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকে স্বাগত জানাতে কার্পণ্য করেন নি। নিষ্ঠুর নরহত্যাকারী দস্যু তাঁর সংস্পর্শে এসে নতুন ভাবে জীবন চালনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অঙ্গুলিমালের কাহিনীতে। বুদ্ধ যখন কিছুদিনের জন্য শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি দস্যু অঙ্গুলিমালের কথা প্রথম শুনতে পান। অঙ্গুলিমাল শ্রাবস্তীর বিভিন্ন অঞ্চলে বহুকাল ধরে লুণ্ঠন ও নরহত্যা করে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। তাকে দমন করার সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছিল। রাজশক্তির প্রতি প্রবল ঔদাসিন্য দেখিয়ে অঙ্গুলিমাল তার লুণ্ঠন ও হত্যালীলা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছিল। অঙ্গুলিমালের হাতে নির্দোষ নিরীহ নরনারীর নিগ্রহের কাহিনী শুনে বুদ্ধ তাঁর ধর্মবলের সাহায্য এই পশুশক্তি দমন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। তিনি একদিন কোশল রাজধানী ছেড়ে যে অরণ্যে অঙ্গুলিমালের বাসভূমি ছিল সেই অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে সামান্য দু' একজন ভিক্ষু। যাঁরা বুদ্ধের সঙ্কল্পের কথা জানতে পারলেন তাঁরা সকলেই তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর সঙ্কল্পে অটল। অরণ্যের কাছাকাছি পৌছে বুদ্ধ তাঁর সঙ্গীদের বাইরে অপেক্ষা করতে আদেশ দিয়ে একা সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সেই অরণ্য এত গভীর যে তাতে সূর্যালোক পর্যন্ত প্রবেশ করতো না। দস্যু অঙ্গুলিমালের ভয়ে সে অরণ্যপথে মানুষ তো যাতায়াত করতোই না; হিংস্র প্রাণীও সে অঞ্চল থেকে প্রায় অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধ সেই স্বল্পালোকিত পথে নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে চললেন। অনেকখানি পথ অগ্রসর হবার পর সহসা বনভূমি কাঁপিয়ে কর্কশ কণ্ঠে কে যেন বলে উঠলো: ওহে ভিক্ষু আর এক পা এগিয়ো না, যেমন আছ তেমনি থাকো। বুদ্ধ তাঁর সদাপ্রসন্ন দৃষ্টি তুলে দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ দর্শন নরঘাতক দস্যু। তার গলায় ঝুলছে মানুষের আঙ্গুলের মালা। পথিকদের হত্যা করে এই দস্যু তার হাতের আঙ্গুল কেটে তাই দিয়ে মালা তৈরী করে গলায় ঝুলিয়ে রাখতো। তাই তার নাম হয়েছিল অঙ্গুলিমাল। বুদ্ধ নির্ভয়ে সেই ভীমদর্শন দস্যুর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন: 'আমি তো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছি, তুমি বরং থামো।' দস্যু তার কথা

শুনে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল। যার ভয়ে দেশের শাসক শ্রেণী পর্যন্ত ভীত, একজন সামান্য ভিক্ষু তাকে দেখে এতটুকু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো না—এরকম সম্ভাবনার কথা অঙ্গুলিমাল কোনদিন ভাবতে পারে নি তাই সে অবাক হয়ে রইল। তারপর সে বুদ্ধের কাছে তাঁর কথার অর্থ জানতে চাইলো। বুদ্ধ তখন তাকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি অহিংসা ধর্মে স্থির ও অচঞ্চল হয়ে আছেন—তাই তিনি অঙ্গুলিমালকে তার হিংসাবৃত্তি পরিহার করে অহিংসা ব্রতে স্থির হবার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর কথা শুনে এবং তাঁর দর্শনলাভ করে অঙ্গুলিমালের মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এলো, অনুশোচনায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। দস্যু অঙ্গুলিমাল ভিক্ষুর চরণে প্রণত হয়ে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করলো আর তাঁর কাছে থেকে গ্রহণ করলো তাঁর সঞ্জীবনী অহিংসা মন্ত্র।

অঙ্গুলিমাল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বুদ্ধের সাহচর্যে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করলো। অঙ্গুলিমালের মত দুর্দান্ত নরহত্যাকারী দস্যুর জীবনেই বুদ্ধ শুধু পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন তা নয়, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু-নরনারা তাঁদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা পরিহার করে অহিংসা ও মৈত্রীকে জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি আবেদন জানাতেন আব এই আবেদনে সাড়াও পেতেন প্রচুর।

আঠার

বোধিগয়ায় সিদ্ধিলাভ করার পর চুয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘকাল ধরে বুদ্ধ প্রতিদিন অগণিত ভক্তকে তাঁর উপদেশ বাণী শুনিয়েছেন, অপর সম্প্রদায়ভুক্ত বহু নরনারীকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। তাঁর প্রচার কার্যের ফলে আর্যাবর্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটেছিল। কিন্তু বুদ্ধ ক্রমশঃ উপলব্ধি করলেন যে তাঁর আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করতে উদ্যত, আর বেশীদিন তাঁর পক্ষে শরীর ধারণ সম্ভব হবে না। আনন্দ গত পঁচিশ বছর ধরে ছায়ার মত তাঁর অনুগামী ছিলেন। তথাগতের দৈহিক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে একথা আনন্দ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন তাই তিনি তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতেন বুদ্ধের প্রতি পদক্ষেপের প্রতি। তবু আনন্দের এক একবার মনে হতো যে বুদ্ধের আরো অনেক কথা বলার বাকী আছে, ধর্ম সম্বন্ধে সকল নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত তথাগত দেহরক্ষা করবেন না। একদিন কথা প্রসঙ্গে আনন্দ বুদ্ধের কাছে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করলেন। আনন্দর কথা শুনে বুদ্ধ তাঁকে বললেন: "সঙ্ঘ আমার নিকট কি প্রত্যাশা করে? আমি তো ধর্ম সম্বন্ধে যা বক্তব্য ছিল সবই বলেছি। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি আমার বয়স এখন আশী; পুরাতন জীর্ণ শকটের মত বহুকষ্টে আমার দেহযন্ত্রকে রক্ষা করতে হচ্ছে। এখন অনন্যচিত্তে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যতক্ষণ থাকি মাত্র ততক্ষণ সুস্থবোধ করি সুতরাং এখন থেকে তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করতে শেখো।"

বুদ্ধ বৈশালী অবস্থানকালে দুর্বল দেহ নিয়ে প্রতিদিন ভিক্ষায় বার হতেন। সঙ্গে আনন্দ আর দু'একজন ভিক্ষু ছাড়া কেউ থাকবার অনুমতি পেতো না। ভিক্ষা সংগ্রহ করে ফিরে এসে ভিক্ষালব্ধ অন্ন থেকে আহার্য প্রস্তুত করা হতো। আহারান্তে বুদ্ধ নিজের হাতে পাত্র ধুয়ে আনতেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম

গ্রহণের পর তিনি কোন নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হতেন। ধ্যানভঙ্গ হবার পর তিনি নানাবিষয় নিয়ে আনন্দের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সংসারবিরাগী সর্ববন্ধনমুক্ত পুরুষ হয়েও বুদ্ধ সৌন্দর্য পিপাসু ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসী সুলভ কাঠিন্যের আবরণে একটি শিল্পরসিক, কাব্যধর্মী মনের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর জীবনী এবং উপদেশ আশ্রয় করে পরবর্তী কালে যে বিরাট সাহিত্য রচিত হয়েছিল তাতে মানুষ-বুদ্ধের সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায় কিন্তু এই সীমায়িত পরিচিতির মধ্যে বুদ্ধের সৌন্দর্য-রসিক মনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত নির্জন শিংশপা কুঞ্জ থেকে দূরে জনাকীর্ণ প্রাসাদ-বহুল বৈশালী নগরীর যে চিত্রটী বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল তার অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে তিনি আনন্দের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছিলেন। এরপর প্রতিনিধিমূলক আর কোনো সভায় সমাগত শিষ্যদের কাছে উপদেশ বিতরণ করার সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি।

বৈশালীর পর কুশীনগর বুদ্ধের গন্তব্যস্থল। যেদিন বৈশালী ত্যাগ করে বুদ্ধের কুশীনগর যাত্রার কথা সেদিন তাঁকে খানিকটা অন্যমনস্ক দেখে আনন্দ বিস্ময় অনুভব করেছিলেন। যখন রাজপথ থেকে আর একটু অগ্রসর হলেন বৈশালী আর দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইস্থান থেকে যখন বুদ্ধ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বৈশালীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তখন আনন্দ তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। বুদ্ধ তাঁকে বল্লেন: "এই আমার শেষবারের মত বৈশালী দেখা।" বুদ্ধের কথায় আনন্দ মর্মান্তিক আঘাত পেলেন আর কোন কথা না বলে দু'জনে নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। পথে বৃজি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আম্রগ্রাম, হস্তিগ্রাম প্রভৃতি জনপদ উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভোগ নগরে উপস্থিত হলেন। চিরাচরিত প্রথানুসারে নগরের অভ্যন্তরে অবস্থান না করে তিনি নগরের অদূরে অবস্থিত শিংশপা কুঞ্জে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এইস্থানে অবস্থান করার সময় ভূমিকম্প হয়েছিল এবং তার ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বুদ্ধ তাদের নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বৃজি রাজ্য অতিক্রম করে বুদ্ধ মল্ল জনপদে উপস্থিত হলেন। এই জনপদের একটির পর একটি গ্রাম অতিক্রম করে বুদ্ধ যখন ক্রমশঃ মল্লরাজধানী কুশীনগর অভি-মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মল্লরা এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তাঁদের

অনুরোধে বুদ্ধ ধর্ম বিষয়ে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। একদিন উপদেশ দানের পর সকলে যখন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমনে উদ্যত তখন পাবা নিবাসী চুন্দ নামে জনৈক কর্মকার বুদ্ধকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ নিরুত্তর হয়ে রইলেন। তাঁর শিষ্যরা বুঝতে পারলেন করুণাময় ভগবান চুন্দের প্রার্থনা রক্ষা করতে সম্মত হয়েছেন। পরদিন বুদ্ধ যথাসময়ে চুন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন। অতিথির জন্য চুন্দ সাধ্যমত উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করলেন। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে যে সব উপকরণ ছিল তাদের মধ্যে একটিকে শূকর-মদ্দব বলে বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে শূকর-মদ্দব শূকর-মাংস ছাড়া আর কিছুই নয়। আহার্য পরিবেশন করা হ'লে বুদ্ধ চুন্দকে উদ্দেশ করে বললেন: "চুন্দ, তুমি যে সব আহার্য প্রস্তুত করেছ তাদের সব কটি আমি গ্রহণ করবো। কিন্তু এদের মধ্যে যে পাত্রটিতে তুমি শূকর-মদ্দব পরিবেশন করেছ সেটা এক মাত্র আমি ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করো না। আমার পাত্রে আমার ভুক্তাবশিষ্ট যা থাকবে সেটা তুমি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিও। কোনো প্রাণী যেন তা গ্রহণ না করে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো, কারণ এই খাদ্য গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন শক্তি কারোর নেই।" বুদ্ধ নীরবে আহার গ্রহণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শিষ্যদের নিয়ে সেস্থান ত্যাগ করলেন। খানিক পরে বুদ্ধ শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে যন্ত্রণা দুঃসহ হতে লাগলো। শীঘ্রই তাঁর দেহে রক্তামাশয়ের লক্ষণ দেখা গেল। তীব্র বেদনা ও রক্তপাত হেতু তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু দৈহিক পীড়া অগ্রাহ্য করে বুদ্ধ পাবা থেকে কুশীনগর অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। পাবা থেকে কুশীনগরের দূরত্ব দীর্ঘ না হলেও অসুস্থ দেহের পক্ষে এ দূরত্ব অতিক্রম করা কষ্টকর। কিন্তু সে সব কষ্ট গ্রাহ্য না করে মনে দুর্বার সাহস অবলম্বন করে বুদ্ধ অগ্রসর হয়ে চললেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তাঁর মনে হলো যেন তাঁর দেহের সকল শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তাই তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পথের এক পার্শ্বে বসে পড়লেন। ক্ষণকালের জন্য তিনি উত্থান শক্তি রহিত হয়ে পড়লেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আনন্দ একখানি চীবর চার ভাঁজ করে

গাছের ছায়ায় বিছিয়ে দিলেন। বুদ্ধ সেইখানে শুয়ে রোগযন্ত্রণা উপশমের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বেদনার উপশম হলো না। ক্রমে তাঁর দেহে পীড়ার প্রকোপ অধিকমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বুদ্ধ দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরে শয়ন করলেন এবং তাঁর মুখে চোখে রোগজনিত বিকৃতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তাঁর রোগার্ত দেহের দিকে তাকাতে আনন্দ পীড়া বোধ করছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার কাছে বসে যথাসাধ্য পীড়ার উপশমের চেষ্টা করতে লাগলেন। একটু পরে বুদ্ধ পিপাসার্ত হয়ে আনন্দকে পানীয় জল আনতে আদেশ করলেন। যে শালবৃক্ষের নীচে বুদ্ধের রোগশয্যা প্রস্তুত হয়েছিল তারই অনতিদূরে ছিল ককুস্তন নদী। এটি গণ্ডকীর একটি শাখা। আনন্দ ভৃঙ্গার হাতে নিয়ে সেই নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করে আনন্দ বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললেন নদীতীর লক্ষ্য করে। কিন্তু যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন দেখতে পেলেন সেই অগভীর নদীর জল অত্যন্ত কর্দমাক্ত। একটু আগেই অনেকগুলো গাড়ী পর পর নদী পার হয়ে যাওয়ায় নদীর জল যে রকম ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল তা পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আনন্দ ভৃঙ্গার পূর্ণ করে জল নিয়ে বুদ্ধের কাছে ফিরে গেলেন। পিপাসার্ত বুদ্ধ হাত বাড়ালেন জলপূর্ণ ভৃঙ্গারের দিকে, কিন্তু আনন্দ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে বললেন : ভগবান্! এ জল আপনার পানের অযোগ্য, আপনি এ জল দিয়ে হাতমুখ প্রক্ষালন করতে পারেন, কিন্তু এ জল আপনাকে পানের জন্য দিতে পারি না। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, অদূরেই হিরণ্যবতী নদী, আমি সেখান থেকে যতশীঘ্র সম্ভব আপনার জন্য বিশুদ্ধ জল নিয়ে আসছি। আনন্দের কথামত বুদ্ধ সেই জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। আনন্দ আবার ভৃঙ্গার হাতে হিরণ্যবতী নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অল্পক্ষণ পরে আনন্দ জল নিয়ে এলেন। সেই জল পান করে বুদ্ধ কিছু সুস্থ বোধ করলেন মনে হলো। এতক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি দক্ষিণপার্শ্ব হয়ে শুয়েছিলেন। এবার তিনি ঐ শয্যায় উঠে বসলেন। তাঁর রোগ যন্ত্রণা প্রশমিত হয়নি—তবু তাঁর দীর্ঘঋজু দেহে যন্ত্রণার কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। কিছুক্ষণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থেকে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন, তাঁর চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হলো, তারপর দেহে স্পন্দনের চিহ্ন রইল না। শিষ্যরা এবং আনন্দ উপলব্ধি করলেন যে বুদ্ধ ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন।

বুদ্ধ যখন ধ্যানাসনে আসীন তখন পুক্কুস নামে মল্লবংশীয় জনৈক ব্যক্তি সেইস্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্জন বৃক্ষতলে শিষ্য পরিবৃত ঐ ধ্যাননিবিষ্ট মূর্তি দেখে ভাবলেন ইনি নিশ্চয়ই কোনো মহাযোগী, মহাপুরুষ। পুক্কুস তাঁর যাত্রা স্থগিত রেখে সেই বৃক্ষতলের অদূরে উপবিষ্ট হলেন। বহুক্ষণ পরে যখন বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ হলো তখন তিনি পুক্কুসকে তাঁর কাছে আসতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁর কথার উত্তরে পুক্কুস জানালেন যে তিনি আলার কালামের শিষ্য। পুক্কুস কালামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বল্লেন: যখন কালাম ধ্যাননিবিষ্ট হতেন তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেতো, একবার তিনি একটি মুক্তস্থানে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকাকালীন বাহিরের জগত সম্পর্কে তাঁর এতদূর জ্ঞানলোপ পেয়েছিল যে ধ্যানভঙ্গ হবার পর তিনি এই দেখে বিস্মিত হলেন যে বহুক্ষণ ধরে সেই স্থানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং বজ্রাঘাতে তাঁরই অদূরে দুটি কৃষক এবং তাদের গৃহপালিত পশুর প্রাণনাশ হয়েছিল। পুক্কুস তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে বললেন যে আজ এই মহাপুরুষকে তিনি যে রকম ধ্যান নিবিষ্ট দেখেছেন সেইরকম ধ্যানরত মূর্তি তিনি বহুকাল দেখেন নি। পুক্কুসের ভারী ইচ্ছা যে তিনি আরো কিছুকাল এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবার উপায় ছিল না, কারণ তিনি বিশেষ কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাচ্ছিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে পুক্কুস বুদ্ধকে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ একটি বহুমূল্য বস্ত্র গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ সাধারণতঃ এইরূপ দানগ্রহণ করতেন না কিন্তু পুক্কুসের ধর্মভাব দেখে তিনি প্রীত হয়ে সানন্দে তাঁর দান গ্রহণ করলেন।

উনিশ

পুক্কুস বিদায় গ্রহণ করে চলে যাবার পর বুদ্ধ আরো কিছুক্ষণ সেইস্থানে বিশ্রাম করলেন—তারপর একটু সুস্থবোধ করায় তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে ককুত্থন নদী অভিমুখে যাত্রা করলেন। নদীতীরে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ প্রথমে স্নান ও পরে জলপান করে কথঞ্চিৎ সুস্থবোধ করলেন। তাঁর বোধ হলো তাঁর দেহের শক্তি অনেকখানি ফিরে এসেছে। শিষ্যরা তাঁকে আরো কিছুক্ষণ সেইস্থানে বিশ্রাম করতে অনুরোধ জানালে তিনি নদীতীরে একটি আমবাগানে গাছের তলায় শয্যা রচনা করতে আদেশ দিলেন। শিষ্যরাও সেইস্থানে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। শায়িত অবস্থা থেকেই বুদ্ধ শিষ্যদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি চুন্দের প্রদত্ত আহার্য সম্পর্কে জানালেন যে কেউ যদি মনে করে যে চুন্দের প্রদত্ত শূকর-মদ্দব গ্রহণ করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং এই কারণে কেউ যদি চুন্দকে দোষারোপ করে তাহলে সে কাজ অত্যন্ত অনুচিত হবে। তিনি স্বেচ্ছায় আহার্য গ্রহণ করেছেন এবং এই আহার্য পরিবেশনে চুন্দের কোনো অপরাধ হয়নি একথাই তিনি বার বার শিষ্যদের বোঝাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধ পুনরায় যাত্রা করলেন। ক্রমে তাঁরা হিরণ্যবতী নদীতীরে এসে পৌছলেন। এই নদী পার হয়ে তারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চললেন। নির্জন পথ, নীচু উপত্যকা ভূমি, দু'ধারে ছায়াঘন সারিবদ্ধ বৃক্ষের শ্রেণী, পথ চলতে বুদ্ধের চোখে যে সব প্রাকৃতিক শোভা প্রতিভাত হলো, বার বার তিনি সে বিষয়ে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা কয়লেন। তাঁর চলার গতি ক্রমশঃ শ্লথতর হয়ে আসছিল কিন্তু দেহের যন্ত্রণা এবং শক্তিক্ষয় সত্ত্বেও তাঁর মনের প্রফুল্লতা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। কিন্তু দেহের সঙ্গে মনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত দেহেরই জয় হলো। তাঁর যন্ত্রণা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পেলো যে তিনি বাধ্য হয়ে শিষ্যদের বললেন আর অগ্রসর হওয়া তাঁর

পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁরা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁর বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করেন।

কুশীনগরের উপকণ্ঠে শালকুঞ্জে আনন্দ গভীর যত্নে বুদ্ধের শয্যা রচনা করলেন। কিছুক্ষণ আগে পুক্কুস স্বর্ণ বর্ণের যে মূল্যবান বস্ত্রখণ্ড দান করেছিলেন বুদ্ধ সেই বস্ত্রখানা পরিধান করে শয্যায় আসীন হলেন। রোগের প্রকোপ তীব্রতর হয়ে উঠছিল এবং তার লক্ষণ তাঁর দেহে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তা সত্ত্বেও আনন্দ বুদ্ধকে আজ নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন। পুক্কুসের প্রদত্ত যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বুদ্ধ তাঁর দেহ আবৃত করেছিলেন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে আনন্দ বুদ্ধকে আজ অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন। বুদ্ধের রোগ-পাণ্ডুর মুখখানির দিকে তাকিয়ে আনন্দ দেখতে পাচ্ছিলেন অপরূপ অপার্থিব রূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি ছায়ার মতন বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন। কত বিভিন্ন পরিবেশে বুদ্ধের কত বিভিন্ন রূপ তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছে কিন্তু আজ তিনি বুদ্ধের যে রূপ দেখতে পেলেন তার সঙ্গে তুলনা হয় না। জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের মনে কি চিন্তা দেখা দিয়েছিল আনন্দ হয়তো তার সন্ধান পান নি কিন্তু বুদ্ধের সেদিনকার সেই মূর্তি তাঁকে গভীর রহস্যলোকের সন্ধান দিয়েছিল একথা আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন।

রাজপথের অদূরে এই গভীর শালবন, একান্তে দুটী বনস্পতি অন্যান্য বৃক্ষদের মাথা ছাড়িয়ে অনেকখানি ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছে। তারই নীচে বুদ্ধের শয্যা রচিত হলো। এ শয্যায় আসন গ্রহণ করার পর বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন: আজ রাত্রির দ্বিতীয় যামে আমি দেহ রক্ষা করবো। শিষ্যরা এইরূপ সম্ভাবনার কথা ভেবেছিল। তাঁদের প্রিয় সঙ্ঘগুরুর অন্তিম মুহূর্ত সমাগতপ্রায় একথা তাঁদের অজানা ছিল না, তা সত্ত্বেও বুদ্ধের নিজের মুখ থেকে উচ্চারিত ঐ ক'টি কথা যেন তাঁদের উদ্বেলিত করে তুললো, আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ উপবিষ্ট থেকে বুদ্ধ উত্তর দিকে মস্তক রেখে দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে শয্যায় শয়ন হলেন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বুদ্ধ নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। আনন্দ তাঁর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। নিদ্রিত বুদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি অশ্রুসংবরণ করতে পারছিলেন না। বুদ্ধ যে সব শিক্ষাদান করেছিলেন, আনন্দ সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই সব উপদেশ

গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তিনি কিছুতেই ধৈর্য্যরক্ষা করতে পারছিলেন না। তিনি বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতে পারলেন না। বুদ্ধের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে এই আশঙ্কায় তিনি শয্যাপ্রান্ত ত্যাগ করে অদূরে উপবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তিনি আনন্দকে দেখতে না পেয়ে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যারা তাঁর শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের আনন্দকে ডেকে আনতে বললেন। আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় আনন্দের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধের মুখের দিকে তাকাতেও তাঁর কষ্ট বোধ হচ্ছিল। বুদ্ধ তাঁর প্রিয় শিষ্যের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাকে কাছে ডাকলেন। তারপর তাকে উদ্দেশ্য করে অনুচ্চস্বরে বললেন: "আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল ধরে তথাগতের সেবা করেছ—কর্তব্য পালনে কোনদিন তোমার ত্রুটী হয় নি। যা ঘটবার তা ঘটবেই সুতরাং তুমি দুঃখ পেও না। আমাদের সব চেয়ে প্রিয় যা তাও একদিন ছেড়ে দিতে হয়—এই জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই!"

বুদ্ধের কথা শুনে আনন্দ নিরুত্তর হয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন: ভগবান আপনার পরিনির্বাণ লাভের মুহূর্ত সমাগত, আপনাকে আমরা নশ্বর দেহে ধরে রাখতে পারবো না জ্যান, তবু ভাবতে কষ্ট হয় যে কুশীনগরের মত অখ্যাত স্থানের এই শালবনে আপনি নির্বাণ লাভ করবেন। রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতি সমৃদ্ধ এবং জনবহুল নগরীতে আপনার অনুরাগী ভক্ত এবং শিষ্যের অন্ত নেই, আপনি এই সকল নগরের যে কোনো একটিকে নির্বাণ-লাভের স্থান বলে নির্বাচিত করলেন না কেন?"

আনন্দের প্রশ্ন শুনে বুদ্ধ কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইলেন। তারপর তিনি আনন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন: "এই কুশীনগরও অখ্যাত স্থান নয়—এই স্থানে পূর্বে বহু ধর্মপ্রাণ নরপতি রাজত্ব করে গেছেন। তাছাড়া এই নগরের অধিবাসী মল্লরা আমার পরম ভক্ত, সুতরাং ইচ্ছা করেই আমি এইস্থান মনোনীত করেছি।"

আনন্দের সঙ্গে বুদ্ধের যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন উপবাণ নামে জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের দেহের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর ফলে বুদ্ধের পক্ষে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল তাই তিনি ইঙ্গিতে

উপবাণকে সেইস্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। উপবাণ লজ্জিত হয়ে দূরে সরে গেলেন। আনন্দ বুদ্ধের কাছে জানতে চাইলেন তাঁর নির্বাণলাভের পর তাঁর দেহের প্রতি তাঁরা কি ভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন এবং দেহের সংকারের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। বুদ্ধ আনন্দকে এসব নিয়ে ভাবতে নিষেধ করলেন—শুধু বললেন, "এ সম্বন্ধে সমাগত জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জন যে উপদেশ দেবেন সেইমত ব্যবস্থা করলে যথেষ্ট হবে।"

ইতিমধ্যে বুদ্ধের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ মল্ল জনপদে প্রচারিত হয়েছিল। তার ফলে দলে দলে মল্লবংশীয় নরনারীরা যে যেখানে ছিল ছুটে এলো বুদ্ধের দর্শনলাভের আগ্রহে। জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো—তাই একসঙ্গে সকলে ভীড় করলে বুদ্ধের শান্তির ব্যাঘাত হতে পারে এই আশঙ্কা করে আনন্দ এক একটি পরিবারকে স্বতন্ত্র ভাবে বুদ্ধের শয্যাপার্শ্বে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা ধরে স্রোতের মত দর্শনার্থীরা সেই শালবীথিকায় ভেঙ্গে পড়লো। জনতার বিরাম নেই। সংবাদ পেয়ে দূর দূরান্তর থেকেও বহু দর্শনার্থী সেই স্থানে সমবেত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের দিকে তাঁর চিরপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোনো উপদেশ বাণী আর উৎসারিত হলো না। ক্রমশঃ তাঁর দেহে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এমন সময়ে একজন অনুচর এসে আনন্দকে সংবাদ দিলো যে সুভদ্র নামে জনৈক সন্ন্যাসী বুদ্ধের দর্শনপ্রার্থী। কিন্তু আনন্দ বুদ্ধের রোগবৃদ্ধির লক্ষণ দেখে আনন্দ তাকে আসবার অনুমতি দিতে চাইলেন না। অন্তর্যামী বুদ্ধ আনন্দের মনের কথা জানতে পেরে তাঁকে কাছে ডেকে এনে বললেন, সুভদ্রকে যেন ফিরে যেতে না হয়, তাঁকে অবিলম্বে একবার আসবার অনুমতি দেওয়া হোক্। সুভদ্র এলেন—তিনি বয়সে বুদ্ধের চেয়ে বড়, সমস্ত জীবন ধরে তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মনে যে সব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল, তার কোনটীর সমাধানের ইঙ্গিত পাননি। বহুদিন থেকে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অভিলাষী ছিলেন কিন্তু সে সুযোগ এতকাল পান নি—এখন বুদ্ধ অন্তিমশয্যায় শয়ান—সেই সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে এসেছেন তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সুযোগ লাভের জন্য।

সুভদ্রকে দেখে বুদ্ধের চক্ষু রোগপাণ্ডুরতা সত্বেও আনন্দ-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তাঁকে কাছে আসতে বললেন; তারপর সুভদ্র উপবিষ্ট হলে তাঁকে তাঁর জিজ্ঞাস্য নিবেদন করতে বললেন। সুভদ্র তাঁর প্রশ্ন একে একে বলে গেলেন। বুদ্ধ স্থির হয়ে শুনলেন আর ধীর অনুচ্চ কণ্ঠে একটি একটি করে তিনি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। সুভদ্র এবং অন্যান্য শিষ্যরা তন্ময় হয়ে বুদ্ধের বাণী শুনলেন। তারপর সুভদ্র নতজানু হয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু এরপরেও সুভদ্রের আরো একটি আকাঙ্খা অপূর্ণ রইহল। তিনি বুদ্ধের কাছে তাঁর শেষ আকাঙ্খা পূরণের প্রার্থনা জানালেন। তাঁর প্রার্থনা—সামান্য বয়সে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাই চোখের উপর তিনি বুদ্ধের নির্বাণ লাভের দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না, সুতরাং পরম কারুণিক বুদ্ধ সুভদ্রকে তাঁর নির্বাণ গ্রহণের পূর্বে দেহত্যাগের অনুমতি দেন। বুদ্ধ প্রার্থিত অনুমতি দিলেন। সুভদ্র মুহূর্তের মধ্যে ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করে পরিনির্বাণ লাভ করলেন।

একটু পরে বুদ্ধ শিষ্যদের তাঁর কাছ সরে আসতে বল্লেন। সকলেই যখন ভীড় করে তাঁর শয্যার চারিদিক ঘিরে দাঁড়ালেন তখন বুদ্ধ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন তিনি এতদিন ধরে যে ধর্মমত প্রচার করেছেন, সঙ্ঘ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রবর্তন করেছেন সেই সম্পর্কে তাঁদের কোনো বক্তব্য আছে কি না। যদি কোনোও বিষয়ে তাঁদের মনে কোনো প্রশ্ন জেগে থাকে তাহ'লে তাঁদের সন্দেহের কথা যেন তাঁকে অকপটে জানানো হয়। বুদ্ধ একে একে সকলের দিকে তাকলেন কিন্তু কেউ কোনো কথা বললেন না। তাঁদের মৌনভাব দেখে বুদ্ধ ও আনন্দ দুই-ই পরম প্রীতি লাভ করলেন। তারপর বুদ্ধ ধ্যান নিমগ্ন হলেন। তাঁর চক্ষু নিমীলিত এবং দেহ নিস্পন্দ হয়ে এলো। বহুক্ষণ অতিক্রান্ত হবার পরও যখন এই অবস্থার পরিবর্তন হলো না তখন আনন্দের মনে হলো ভগবান বুদ্ধ নির্বাণলাভ করেছেন। আনন্দ তাঁর মনের কথা স্থবির অনুরুদ্ধকে জানালেন। অনুরুদ্ধ বললেন: না, আনন্দ, ভগবান এখনও নির্বাণলাভ করেন নি। অনুরুদ্ধের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো—কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধের দৃষ্টি উন্মীলিত হলো। ক্রমে তাঁর দেহে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেলো। এতক্ষণ পুক্কুস প্রদত্ত

যে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত ছিল এইবার সেই বস্ত্রখণ্ড ত্যাগ করে বুদ্ধ তাঁর দেহের ঊর্দ্ধাংশ অনাবৃত করে শিষ্যদের দেখিয়ে বল্লেন : "তোমরা তথাগতের দেহের প্রতি অবলোকন কর। সকল বস্তুরই বিনাশ হয় সুতরাং এ দেহেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তোমরা শোক করো না।" তারপর বুদ্ধ আর বেশী কথা বলেন নি। ক্রমশঃ তাঁর দেহে পীড়ার লক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে প্রসন্নতার কোনো অভাব দেখা গেল না। আনন্দ তাঁর খুব কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, বুদ্ধ ইঙ্গিতে তাঁকে আরো কাছে ডেকে নিলেন। তারপর শান্ত, ধীর, অনুচ্চ কণ্ঠে বল্লেন : ভবিষ্যতে ভারত-বর্ষে চারিটি তীর্থস্থান গড়ে উঠবে—আর প্রতি বৎসর অগণিত নরনারী এই তীর্থস্থানে তাঁদের ভক্তি নিবেদন করার জন্য সমবেত হবেন। এই চারিটি স্থান—লুম্বিনীগ্রাম যেখানে বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন, বোধিগয়া যেখানে গৌতম বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন, সারনাথ যেখানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং কুশীনগর যেখানে আজ রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করবেন।'

তারপর কিছুক্ষণ বুদ্ধ নীরব হয়ে রইলেন—শিষ্যরাও সেই শান্ত পরি-বেশের উপযোগী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করে সেখানে অপেক্ষা করে রইলেন। বুদ্ধ আরো একটু পরে আনন্দকে কাছে ডেকে বল্লেন : 'সুন্দর এই ভারতবর্ষ, বিচিত্র এখানকার অধিবাসীরা।'

ক্রমে রাত্রি গভীরতর হয়ে এলো, শালবন এবং তার বাইরে অপূর্ব নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। অদূরে অবস্থিত জনপদবাসী গৃহস্থদের আবাসভূমিও নিদ্রার ক্রোড়ে মগ্ন হলো। চারিদিকের সেই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে শালবনের একপ্রান্তে জেগে রইল জনকতক ভিক্ষু। তাদের চোখের উপর ক্রমশঃ অনির্বাণ একটি দীপশিখা স্তিমিত হয়ে আসছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সেই ঘন শাল বীথিকা ভেদ করে তারই আলো বুদ্ধের শয্যা পার্শ্ব আলোকিত করে তুলছিল। সেই চন্দ্রালোকে শিষ্যরা অধীর আগ্রহে তাঁদের প্রিয় নেতার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটু আগে যে মুখ রোগ যন্ত্রণায় পাণ্ডুর বলে মনে হচ্ছিল তাতে এবার নেমে এলো অপূর্ব প্রশান্তি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি শোক দুঃখের

অতীত, কোন এক অপার্থিব জগতের সন্ধান পেয়েছেন। আজীবন যে মহান সত্য উপলব্ধির প্রচেষ্টায় তাঁর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ অকাতরে নিয়োজিত করে এসেছেন সেই দীর্ঘকালের সাধনা আজ তাঁর জীবনে সমাপ্তি এনে দিচ্ছে। আজীবন তিনি আর্যাবর্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যটন করে অগণিত নরনারীকে যে ধর্মে দীক্ষাদান করেছেন সেই ধর্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর মনে অনিশ্চয়তার আর কোনো ছায়াপাত নেই। তাঁর জীবন সার্থকতায় পরিপূর্ণ; আজ তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করতে উদ্যত। যে বিরাট মন ও প্রতিভা একটি নশ্বর দেহকে আশ্রয় করে দীর্ঘ আশী বৎসর বৃদ্ধি পেয়েছিল আজ সেই মন ব্যাপ্তি লাভ করতে চলেছে সহস্র মনের মধ্যে। একটি অনির্বাণ দীপশিখা আজ সহস্র জীবনকে চির ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত যখন সমাগতপ্রায় তখন বুদ্ধের অন্তরে জেগে উঠলো সার্থকতার প্রসন্নতা। আজ তাঁর অন্তরে কোন শূন্যতা নেই! ক্রমশঃ রাত্রি যখন দ্বিতীয় যামে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, তখন বুদ্ধের জীবন দীপ নির্বাপিত হতে লাগলো। ক্রমে রাত্রি তৃতীয় যাম উপস্থিত হলো আর সঙ্গে সঙ্গে শোকার্ত শিষ্যদের চোখের সামনে চৈতন্য হারিয়ে বুদ্ধ মহাপরি-নির্বাণ লাভ করলেন।

আকাশে তখনও পূর্ণিমায় চাঁদ তেমনি দেখা যাচ্ছিল, আগের মতই চারিদিকে তেমনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। গাছের ফাঁক দিয়ে শালবনে তখন এমনি আলোর লুকোচুরি চলছে—তবু সেই শালবনের তলায় যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মনে হচ্ছিল পৃথিবীর বুকে যেন আর এতটুকু আলো অবশিষ্ট নেই। তাঁদের চোখের সামনে নেমে এসেছিল অন্তহীন অন্ধকার। বুদ্ধ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ঠিক সেই সময়টিতে সমস্ত পৃথিবী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠার মত কেঁপে উঠেছিল। আকাশে শোনা গিয়েছিল মেঘগর্জন আর বজ্রপাত। স্বর্গের দেবতারাও নাকি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন।

বিশ

বুদ্ধ যখন পরিনির্বাণ লাভ করেন তখন তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য মহা-কাশ্যপ রাজগৃহের নিকট কালান্তক নিবাস বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। গভীর রাত্রে যখন আকস্মিক ভাবে সমস্ত বেণুবন কেঁপে উঠলো তখন তাঁর কারণ জানবার চেষ্টা কবতে গিয়ে মহাকাশ্যপ বুদ্ধের দেহত্যাগের কথা জানতে পারলেন। বাকী রাতটুকু শিষ্যরা বুদ্ধের দেহের চারদিকে সতর্ক পাহারা রেখে অতিবাহিত করলেন। পরদিন সূর্যোদয় হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ নিজে কুশীনগরের প্রত্যেকটি গৃহবাসীকে বুদ্ধের দেহত্যাগের কথা জানালেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে শেষবারের মত দেখবার জন্য সেই শালবনে এলেন। অগণিত দর্শনার্থীর ভীড়ে শালবন মুখরিত হয়ে উঠলো। মল্লনায়করা, আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করে বুদ্ধের দেহেব যথাযথ সৎকারের জন্য সাতদিন সময় নিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে স্থির করলেন রাজাধিরাজের অন্ত্যেষ্টি যেমন সমারোহে সম্পন্ন করা হয় তেমনিভাবে বুদ্ধের সৎকাব অনুষ্ঠিত হবে। সাতদিন ধরে প্রস্তুতি চললো। তারপর সাতদিনের দিন সোনার পালঙ্কে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প নিয়ে কুশীনগরের অধিবাসীরা বিরাট শোভাযাত্রা করে শালবনে প্রবেশ করলেন। প্রথমে স্থির হলো যে মল্ল পুরনারীরা একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করবেন তারপর বুদ্ধের দেহ সুগন্ধি এবং মাল্যচন্দন দ্বারা সুরভিত করে পালঙ্কের উপর স্থাপন করা হবে। পুরনারীরা সেই পালঙ্ক বহন করে পূর্বদ্বার দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করবেন সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে বুদ্ধের দেহ হিরণ্যবতী পার হয়ে মুকুটবন্ধন চৈত্যে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই স্থানেই তাঁর দেহের সৎকার হবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী বুদ্ধের দেহ পরম যত্নে পালঙ্কে স্থাপন করা হলো কিন্তু যখন মল্ল পুরনারীরা সে পালঙ্ক বহন করবার জন্য এগিয়ে এলেন তখন অনেক চেষ্টা করেও সে পালঙ্ককে এতটুকু নড়াতে পারলেন না। বার বার চেষ্টা

সত্ত্বেও যখন কিছুতেই পালঙ্ক নাড়ানো সম্ভব হলো না, তখন অনিরুদ্ধ আনন্দকে বললেন ভগবান বুদ্ধ নিশ্চয়ই ইচ্ছা করেন নি যে পুরনারীরা তাঁর দেহ বহন করেন। এবার মল্লপুরবাসীদের পালঙ্ক বহনের নির্দেশ দেওয়া হোক। আনন্দ অনিরুদ্ধের কথা সমর্থন করলেন এবং তাদের নির্দেশে যখন মল্লপুরবাসীরা পালঙ্ক বহন করতে এগিয়ে এলেন তখন অতি সহজেই তাঁরা বুদ্ধের দেহসহ পালঙ্ক তুলে নিয়ে চললেন। পালঙ্কের পিছন পিছন চললো শোকাহত অসংখ্য নরনারী এবং ভিক্ষুর দল। নগব অতিক্রম কবে শোভাযাত্রাকারীর দল ক্রমশঃ হিরণ্যবতী অতিক্রম করে মুকুটবন্ধন চৈত্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চললেন। সেদিন কুশীনগবে কোন গৃহেই কোনও জনপদবাসী আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই শোভাযাত্রায যোগ দিয়েছিলেন। নগর পবিক্রমণ কালে শোভাযাত্রাকারীরা সবিস্ময়ে দেখলো যে পথের দু'ধারে যে সব ফুলের গাছ ছিল সেই সব গাছ থেকে অজস্র পরিমাণে ফুল ঝরে পড়ছে। সেই ঋতুতে যে সব ফুল ফোটার কথা নয়, সেই জাতীয ফুলও অজস্র পরিমাণে গাছ থেকে ঝবে পডেছিল। কোনো কোনো স্থানে ফুল এত ঘন বিন্যস্ত হয়ে পডেছিল যে সেই পথ দিয়ে চলতে গিয়ে পথচারীদের হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যাচ্ছিল। যথাকালে শোভাযাত্রীবা মুকুটবন্ধন চৈত্যে উপস্থিত হলেন। তারপর বুদ্ধের দেহ পুষ্পমাল্য চন্দনে সুসজ্জিত করে সুগন্ধি চন্দন দিয়ে সুরভিত চিতায় স্থাপন করা হলো, কিন্তু মল্লরা যখন সেই চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন তখন তাঁদের বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হলো না। এই ব্যাপার দেখে সবাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন। অনিরুদ্ধ তখন আনন্দকে বল্লেন : আমার মনে হচ্ছে বুদ্ধগতপ্রাণ ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহাকাশ্যপ যতক্ষণ এখানে উপস্থিত না হবেন ততক্ষণ এই চিতাগ্নি প্রজ্জলিত করা সম্ভব হবে না। অনিরুদ্ধের কথা শুনে সকলে মহাকাশ্যপের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। অনতিবিলম্বে পাঁচ শত শিষ্য সঙ্গে নিয়ে মহাকাশ্যপ সেইস্থানে উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের অধিবাসীরা মহাকাশ্যপকে সুগন্ধি পুষ্প ও মাল্যচন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। মহাকাশ্যপ ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে যে স্থানে ভগবান বুদ্ধের নশ্বর দেহ রক্ষিত হয়েছিল সেস্থানে গেলেন। তারপর সাতবার সেই দেহ প্রদক্ষিণ করার পর তিনি আভূমি প্রণত হয়ে বুদ্ধের পায়ে শেষ প্রণাম নিবেদন করলেন। মহা-

কাশ্যপের অনুমতি নিয়ে চিতাতে অগ্নি সংযোগ করা হলো। মুহূর্তে চিতা প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে বুদ্ধের পার্থিব দেহাবশেষ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল—শুধু অবশিষ্ট রইল ভস্মাবশেষ। মল্লরা তখন তাঁর পুণ্য দেহাস্থি এবং ভস্মাবশেষ নিয়ে নগরে ফিরে এলেন। কিছুকাল মধ্যে মগধরাজ অজাতশত্রু প্রতিনিধি পাঠিয়ে দাবী জানালেন, "ভগবান বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমিও তাঁর দেহাবশেষের অংশ পাওয়ার অধিকারী।" অজাতশত্রুই একমাত্র দাবী করলেন তা নয়, ক্রমে বৈশালীর লিচ্ছবি, কপিলাবস্তুর শাক্য, রামগ্রামের কোলিয়, অল্লকপ্পের বুলিগণ এবং পাবাগ্রামের মল্লরাও অনুরূপ দাবী জানালেন। প্রথমে কুশীনগরের মল্লরা তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, তাঁরা বলে পাঠালেন যেহেতু ভগবান বুদ্ধ তাদের রাজ্যে দেহত্যাগ করেছেন সুতরাং তাঁরাই তাঁর দেহাবশেষ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুশীনগরের অধিবাসীরা সকলের সঙ্গে ভগবানের দেহাবশেষ ভাগ করে নিতে সম্মত হলেন। বুদ্ধের দেহাবশেষ আটটি ভাগে ভাগ করে প্রার্থীদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হলো। পিপ্পলীবনের মোরিয়গণ অনুরূপ দাবী উত্থাপন করেছিল কিন্তু তারা যথাকালে উপস্থিত হতে পারে নি বলে তাদের শুধু চিতাভস্ম নিয়ে ফিরে যেতে হলো।

আশী বছর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমা যে মহামানবের জন্মমুহূর্ত ঘোষণা করেছিল দীর্ঘকালের ব্যবধানে আর একটি বৈশাখী পূর্ণিমা সেই জীবনের পরিসমাপ্তি এনে দিল। বুদ্ধের নশ্বর দেহ প্রকৃতির বিধানে বিলীন হয়ে গেল কিন্তু মানুষের মনে বুদ্ধ বেঁচে রইলেন মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবরূপে।

একুশ

—তথাগতের শিক্ষা—

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে ইতিহাসের অভিযান চলেছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। কখনও তার গতি মন্থর, কখনও দুর্বার তবু তার গতির বিরাম নেই। গতিশীল ইতিহাসের স্রোতের আবর্তে কত রাজা, কত রাজ্য বিলীন হয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই। তবু পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এমন দু' একজন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা বহু শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করেও কালজয়ী হয়ে আছেন। সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয়। কিন্তু তাঁদের আবির্ভাব উপলক্ষ্য করেই মানুষ নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেও 'আত্মদীপ' হয়ে আলোর সন্ধান পায়। এমনি কালজয়ী, জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ বুদ্ধ।

লুম্বিনীর উদ্যানে বৈশাখী-পূর্ণিমাতে যে 'মৃত্যুতারণ, শঙ্কাহরণ, মহাজীবনের' সূচনা হয়েছিল, মহাভিনিষ্ক্রমণের পথ বেয়ে তার পরিণতি দেখা দিয়েছিল বোধিদ্রুমতলে। তারও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল পরে আর একটি বৈশাখী-পুর্ণিমা এই মহাজীবনের চলার পথে সমাপ্তি এনে দিয়েছিল কুশীনগরের শালবনে। আশী বছর বয়সে বুদ্ধের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী এই মহামানব অক্ষয়, অমর হয়ে বেঁচে রইলেন মানুষের মনে।

বুদ্ধের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ। এই যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধর্ম চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও অনুভূতির বিরুদ্ধে একাধিক দেশে জনগণের মনে বিদ্রোহের স্ফুরণ এই যুগকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে তুলেছিল। এই

যুগে চীনদেশে লাওৎসে ও কনফুসিয়াস, গ্রীসে পারমেনিডিনস্ এবং এমপেডো-কল্‌স, ইরাণে জরথুস্ত্র এবং পূর্বভারতে বুদ্ধ ও মহাবীর ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় বৈদিক ধর্ম আদর্শচ্যুত হয়ে ক্রিয়াকাণ্ড-সর্বস্ব বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হওয়ায় জনগণের মনে এই ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হয়ে আসছিল। উপনিষদ প্রচাবিত ধর্মের প্রকৃত মর্ম বিস্মৃত হয়ে ভারতবাসী ক্রিয়াকাণ্ডবহুল অনুষ্ঠানকেই ধর্মের নামান্তর বলে গ্রহণ করেছিল। সোমরস পান ও পশুবলির উৎকটতা বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের মনকে এমনি আচ্ছন্ন ও মোহাবিষ্ট কবে তুলেছিল যে তাদের মধ্যে সদাচরণের প্রবৃত্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠলো। জাতিভেদের কৃত্রিম প্রাচীর, মানুষে মানুষে অশুভ ভেদ সৃষ্টি করে সমাজ জীবনেব ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলে-ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে সমাজ ও ধর্ম জীবনের ক্ষেত্রে যখন এমনি ধরনের অবাঞ্ছিত পরিবেশ আত্মপ্রকাশ কবে তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে দেখা দেয় বিপ্লব। খ্রীষ্টপূর্ব-ষষ্ঠ শতকে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীব মনে বিপ্লবের প্রেবণা যোগালেন বুদ্ধ। কিন্তু বিপ্লবের প্রলয়ঙ্কর রূপকে তিনি ধ্বংসের পথ এড়িয়ে চালিত করলেন শান্তিপূর্ণ, কল্যাণপ্রদ সৃষ্টি-মূলক কর্ম প্রচেষ্টার পথে।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যখন ধর্ম ও সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তা আব অনুষ্ঠান-সর্বস্বতার প্রাধান্য চলছে তখন আবির্ভূত হলেন যুগন্ধর মহামানব বুদ্ধ। বোধিদ্রুম তলে দীর্ঘ, দুঃসহ তপশ্চর্যায় সিদ্ধিলাভ করে তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। সার্থকতার আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—

"আমি কাশী গিয়ে এমন এক প্রদীপ জ্বালবো যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকের সন্ধান দিয়ে আলোকিত করবে। আমি এমন এক ঢক্কানিনাদ করবো যা সুপ্ত মানবজাতিকে করবে জাগ্রত। আমি নীতি শিক্ষা দেব, আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি আমি ধর্মপ্রচার করবো।"

এরপর থেকে চললো বুদ্ধের নিরলস পরিক্রমা, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে; ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের মনে পৌছে দিলেন তিনি অমৃতলোকের আহ্বান। তাঁর বিপুল সৃজনীমূলক কর্ম প্রচেষ্টার ফলে বিপ্লব ধ্বংসাত্মক পথে অগ্রসর না হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে সংযোজন করলো

এক নতুন অধ্যায়, সৃষ্টি করলো নতুন মানুষ। আশাহত লক্ষ লক্ষ নরনারীর মনে ধ্বনিত হয়ে উঠলো আশার সঞ্জীবনী মন্ত্র। বুদ্ধের লোকান্তর প্রাপ্তির পরে তাঁর আবেদন আরও দুর্বার হয়ে দেখা দিল। ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে সমুদ্র, পর্বতের বাধা লঙ্ঘন করে, তাঁর বাণী স্পর্শ করলো কোটি কোটি মানুষের অন্তর। তাঁর ত্রিশরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শ্যাম, কম্বুজ, সুবর্ণভূমি, সুবর্ণ দ্বীপ, গান্ধার, তিব্বত, চীন জাপান, সিংহল, মধ্য ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার সীমান্তবাসী অসংখ্য নরনারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শবণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

বুদ্ধেব পরিনির্বাণের তিনশত বৎসরের মধ্যে তাঁর প্রচারিত ধর্ম রূপান্তরিভ হলো বিশ্বব্যাপী এক মহাধর্মে। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসের বুদ্ধের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। বুদ্ধের বাণীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ভারতীয় সাধনার শাশ্বত বাণী। তপোবনের সঙ্গোপনে ভারতবাসীর মানসক্ষেত্রে সভ্যতা ও সাধনার যে রূপটি ভেসে উঠেছিল তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে। জাতীয় ধর্ম ও দর্শন থেকে স্বতন্ত্র কোন মতবাদ বা ধর্ম সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি বুদ্ধ। দুঃখময় জগতের কল্পনা সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনেও স্থানলাভ করেছে। ন্যায় বৈশেষিকেও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তিলাভের সোপান বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনেরও একই কথা—জগত দুঃখময়। জরা মৃত্যু ব্যাধি জনিত মানুষের দুঃখ উপলব্ধি করে বুদ্ধ বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে 'জাতি প্রত্যয়ং হি জরামরণম্।' জাতি অর্থাৎ জন্মবন্ধ বা বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকাই জরামরণের কারণ। এ সম্পর্কে গভীরতর আলোচনা করে তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে 'জাতির্ভবতি ভব-প্রত্যয়াৎ' অর্থাৎ 'ভব' বা উৎপত্তিই হলো জাতির মূল বা উপাদান। এই উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তৃষ্ণাই এর মূল। আসক্তি থেকেই হয় তৃষ্ণার উৎপত্তি আর অবিদ্যার প্রভাবেই তৃষ্ণার বৃদ্ধি পায়। দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা। সুতরাং অবিদ্যা জয় করতে পারলেই দুঃখনাশ হয়।

দুঃখনাশের চরম অবস্থাই বহু-ঈপ্সিত মুক্তি বা পরিনির্বাণ। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে ব্রহ্মবিহারের পথে সাধনার কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয়। শীল গ্রহণ করলেই চরিত্র গড়ে ওঠে। তিনি শিষ্যদের মাধ্যমে মানুষমাত্রের কাছেই আহ্বান জানিয়েছেন 'পানং ন হানে', প্রাণীকে হত্যা করবে না। এই প্রথম শীল। 'ন চ দিন্নমাদিয়ে' যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা গ্রহণ করো না। এই আর একটি শীল। 'মুসা ন ভাসে', মিথ্যা কথা বলবে না। এও একটি শীল। 'ন চ মজ্জপো সিয়া', মদ খাবে না। এই আর একটি শীল। এমনি ভাবে একটির পর একটি শীল অভ্যাস করে চিত্তশুদ্ধি আনতে হবে। মুক্তিকামী নরনারী মাত্রেই এই বলে শীল অভ্যাস করবে—

"আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি, এই শীল পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোন স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে আচরিত হয় না, এই শীল বিদ্বজ্জনের অনুমোদিত। এই শীল অনুসরণ করেই মুক্তিলাভের সন্ধান পাওয়া যাবে, মঙ্গল লাভ হবে, লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা দ্বারা অভিভূত না হয়ে যারা শোক ও মালিন্য পরিহার করে চলবে তাদের দ্বারাই সাধিত হবে উত্তম মঙ্গল।"

এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়। কিন্তু মঙ্গল লাভই চরম আদর্শ নয়। প্রেম ও মৈত্রীভাব জাগ্রত করাই চরম লক্ষ্য। যারা এই সাধনায় সিদ্ধ হতে চায় তাদের প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে —

সব্বে সত্তা সুখিত হোন্তু, অবেরা হোন্তু
অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু
সব্বে সত্তা যথালদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

অর্থাৎ সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে

বঞ্চিত না হোক। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব প্রসারিত করা বুদ্ধের চরম উপদেশ।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি 'অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

অর্থাৎ যে কোন প্রাণী আছে, কী সবল, কী দুর্বল, কী দীর্ঘ, কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম, কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম, কী স্থূল, কী দৃষ্ট, কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করে বা যারা কাছে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্ম পরিগ্রহ করবে অনবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হোক।

বুদ্ধের বাণীতে কোন অস্পষ্টতা নেই, জটিলতা নেই। উদ্দেশ্যকে খর্ব করেন নি তিনি, আবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথকেও তিনি অনাবশ্যকভাবে কণ্টকিত করে তোলেন নি। নির্বাণলাভের পথকে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এই আটটি উপচারকে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই পথে যারা চলবেন, তাঁদের মোক্ষলাভ অনিবার্য।

সহজ সরল ভাষায় যখন বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করতেন তখন সহজেই তা শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করতো। যে দৃষ্টিভঙ্গী ভারতবাসীর চিন্তাধারাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল তার সঙ্গে বুদ্ধ প্রচারিত মতের কোন অসঙ্গতি নেই। তাই বুদ্ধ অতি সহজেই গণচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ ঋজুদেহ, আয়ত চক্ষু, সুগৌরকান্তি, সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্ব জনসাধারারণের মনে সহজেই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধায় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাজঐশ্বর্যভোগের মোহ ত্যাগ করে যিনি চীরবাস পরিহিত হয়ে স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় সকেলরই মাথা নত হয়ে আসতো। তাঁর কথা ও কাজের

মধ্যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি ছিল। 'আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে'—এই নীতি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলতেন। তাঁর চরিত্রের রাজোচিত গুণাবলী, সাধুজনোচিত অবিমিশ্র শুচিতা, মানবজাতির প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, এক কথায় তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল প্রেরণার শাশ্বত উৎস।

বুদ্ধ যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তার গোড়ায় আরও একটী কথা এই যে, মানুষ তার নিজের চেষ্টা দ্বারাই মুক্তিলাভ করতে পারে; বাহ্য শক্তির সহায়তা অপেক্ষা তিনি চিত্তের উৎকর্ষকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বেশী। চিত্ত শুদ্ধ হলেই সংসারের অলীকত্ব সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হয়ে উঠে। তখন আত্মোপলব্ধির জন্য তার মন উন্মুখ হয়ে উঠে। এই উন্মুখতাই তাকে ধ্যানধারণার মাধ্যমে নির্বাণ অবস্থায় উপনীত হতে সাহায্য করে। মানুষের মধ্যেই যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষ বহু আকাঙ্খিত মুক্তি লাভ করতে পারে—মুক্তির জন্য তাকে দৈব অথবা বাহ্য শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই—এই বলিষ্ঠ মতবাদই মুক্তি-সন্ধানী মানুষের মনে এনে দিয়েছিল নতুন আশা। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে সত্য সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। উরুবিল্বের নির্জন নদীতীরে, বোধিদ্রুমতলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মানুষের প্রতি সীমাহীন করুণা প্রণোদিত হয়ে বুদ্ধ বলেছিলেন—

নাহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং
ন পুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখ তপ্তানাং
প্রাণিনাম্ আর্তি-নাশনম্।

তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য করে তিনি বার বার বলেছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুষা একপুত্ত মনুর কৃখে
এবমপি সব্বভূতেযু
মানসম্ভবয়ে অপরিমাণং।

অর্থাৎ মা যেমন আপন আয়ুক্ষয় করেও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনই সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম দয়াভাব উৎপাদন করতে হবে। বুদ্ধদেবের এই বিশেষ উপদেশের আলোচনা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতা-শূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে, বসতে, চলতে, শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে এই মৈত্রীস্মৃতিতে অবিচলিত থাকবে—একেই বলে বিহার। তিনি মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে অপরিমাণ প্রেমই আপন অন্তরের সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে। মানব দেবতাকে তিনি মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব এই উপদেশ দিতে পেরেছিলেন।'

বুদ্ধদেবের এই অপরিমাণ মৈত্রী আর মানুষের প্রতি প্রেমই তাঁকে মানুষের মনে অবিচলিত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে।

পরবশগত ভারতবর্ষ দীর্ঘ কাল আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। আজ স্বাধীনতার দীপালোকে ভারতবর্ষ তার অবিনশ্বর আত্মাকে পুনরাবিষ্কার করেছে—গ্রহণ করেছে বুদ্ধ প্রচারিত শান্তি ও মানব-মৈত্রীর আদর্শকে। তাই চক্র-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের পতাকা বিশ্ব সৌভ্রাত্রের প্রতীক, অশোক-স্তম্ভ বুদ্ধ বাণীর বাহক আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের মূলনীতি আজ ভারতবর্ষের মহত্তম অবদান বলে স্বীকৃত। ভারতবাসীর দৃষ্টি আজ প্রসারিত হোক বিশ্ববাসীর চোখে, তার আদর্শ সিদ্ধিলাভ করুক, ভেদবিদ্বেষ-জর্জরিত পৃথিবীর বুকে নেমে আসুক শান্তির স্নিগ্ধতা, সহ-অস্তিত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে রচিত হোক বিশ্বশান্তির নবসৌধ—জয় হোক তথাগতের দিব্য সাধনার।

অশ্বঘোষের কথায়—

> শ্রিয়ং পরার্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
> তমো নিরস্যন্নভিভূত ভানুভৃৎ।
> নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমা—
> সংবর্ধতেঽর্হন ইহ যস্য নোপমা॥

অর্থাৎ যিনি পরম সম্পদলাভ করে বিধাতাকে পর্যন্ত জয় করেছেন, সংসারের অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করে যিনি সূর্যকে পরাজিত করেছেন, প্রাণী সাধারণের শোক সন্তাপ নিবারণ করে যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করেছেন, বস্তুতঃ জগতে যাঁর উপমা নেই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি।